# সক্রেটিসের আগে

## সক্রেটিসপূর্ব দর্শন ও দার্শনিক

আহমেদ খালেদ

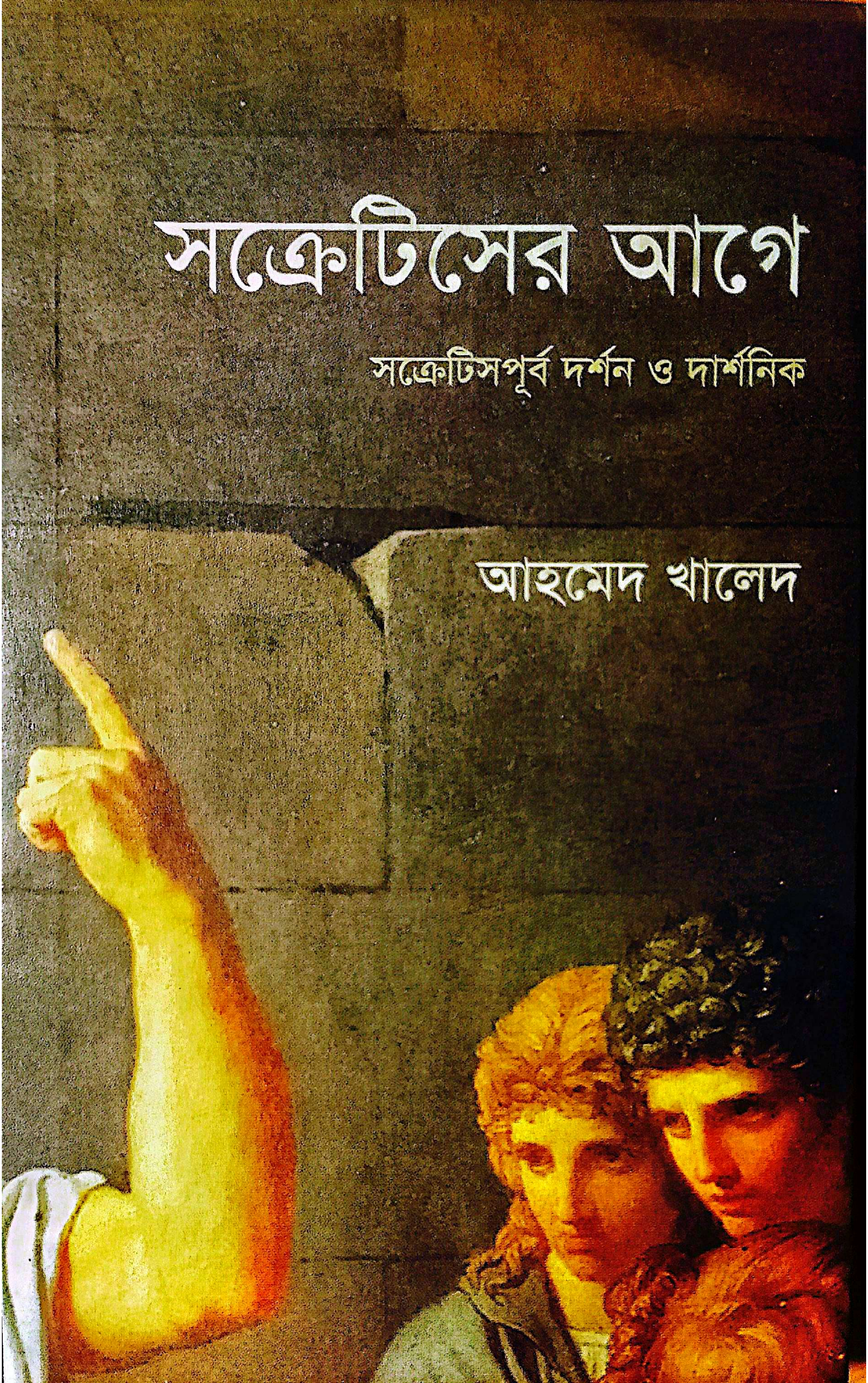

আহমেদ খালেদ

# সক্রেটিসের আগে

## সক্রেটিসপূর্ব দর্শন ও দার্শনিক

সংহতি

১৪১৯

## সূচিপত্র


ভূমিকা ৯

প্রথম অধ্যায়
সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যু ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
গ্রিক দর্শনের জনক ২২

তৃতীয় অধ্যায়
আরো দুই মিলেসীয় ২৮

চতুর্থ অধ্যায়
গণিতের আরাধনা ৩৬

পঞ্চম অধ্যায়
দার্শনিক কবি ৪২

ষষ্ঠ অধ্যায়
বস্তুজগতের পরিবর্তনশীলতা ৪৭

সপ্তম অধ্যায়
বস্তুজগতের স্থিতি ৫৪

অষ্টম অধ্যায়
বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ধর্মপ্রণেতা ৬০

নবম অধ্যায়
এথেন্সে দর্শনচর্চা ৬৭

দশম অধ্যায়
গ্রিক আণবিকবাদ ৭৫

একাদশ অধ্যায়
সক্রেটিসের সময়কাল ৮৩

*তথ্যসূত্র ও টীকা* ৯০

*গ্রন্থপঞ্জি* ৯৬

# ভূমিকা

প্রশ্ন করা থেকেই জন্ম দর্শনশাস্ত্রের। ইতিহাসের সবচেয়ে স্বনামধন্য দার্শনিক সক্রেটিসকে আমরা দেখি, প্লেটোর রচনায়, এথেন্সের পথেঘাটে মানুষজনকে প্রশ্ন করে চলেছেন। সরলমতি সেসব প্রশ্নের ভেতর দিয়ে মানুষকে তিনি শেখাতে চাইছেন কী করে চিন্তা করতে হয়, জিজ্ঞাসু হয়ে উঠতে হয়। সে-জিজ্ঞাসা থেকেই জন্ম দর্শনের, সেইসঙ্গে আত্মদর্শনের।

সক্রেটিসের দর্শন অনেকটাই আত্মদর্শন। মানুষের নিজের জীবন-মন-কাজকে খুঁটিয়ে দেখা সে দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। নৈতিকতার আদর্শে সে দর্শন বলীয়ান। এদিক থেকে তাঁর পূর্বসূরি বেশির ভাগ দার্শনিকের চেয়ে সক্রেটিস ছিলেন অনেকটা স্বতন্ত্র। কিন্তু পূর্বসূরি ওই দার্শনিকেরা কিছু বিষয়ে সক্রেটিস এবং তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের দার্শনিকদের চেয়েও এগিয়ে ছিলেন।

বিশ্বজগৎ ও সৃষ্টি বিষয়ে সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকদের ছিল অসীম কৌতূহল; আর এ কৌতূহল মেটাতে তাঁরা যেসব প্রশ্নের অবতারণা করেন, সেগুলো যেমন ছিল ছেলেমানুষি সারল্যে ভরা, তেমনি জগৎকে জানার অপরিমিত আগ্রহে ভরপুর। তখনকার প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সাথে সে দর্শন মাঝে মাঝে মিলেমিশে গেছে। আবার, অতি প্রাচীন এসব দার্শনিকের কেউ কেউ ছিলেন রীতিমতো নাস্তিক। বিশ্বজগৎ সম্পর্কিত তাঁদের অনুসন্ধিৎসা, নিরীক্ষা ও অনুমানগুলো লক্ষ করে অ্যারিস্টটল এই দার্শনিকদের অনেককে 'প্রাকৃতিক দার্শনিক' অভিধায় ভূষিত করেছিলেন। এই প্রাকৃতিক দর্শন থেকেই জন্ম বিজ্ঞানের।

সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকদের ভাবনা-চিন্তার অনেক কিছুই সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে জন্ম নেওয়া আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণাগুলোর সঙ্গে মিলে যায়। এ মিল আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে প্রাচীন গ্রিসের মনীষীদের রচনাগুলো পুনরায় আবিষ্কার এবং সেগুলোর সোৎসাহ পাঠ ও চর্চা। সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকেরা, সেই অর্থে, ইতিহাসের প্রথম বিজ্ঞানীকুল।

সক্রেটিসের নিজের দর্শনচর্চার ভিতটিও পূর্বসূরি দার্শনিকদেরই গড়ে দেওয়া। সরলমতি যেসব প্রশ্ন তিনি করতেন, প্রশ্ন করবার যে পদ্ধতিকে দর্শনের ভাষায় বলা হয় 'দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি'—সেটিও গড়ে উঠেছিল তাঁর আগের প্রজন্মের দার্শনিক পারমেনিডেস ও জেনোর হাত ধরে; প্রোটাগরাসের মতো সোফিস্ট দার্শনিকদের হাতে প্রশ্ন করার সে রীতি নতুন এক মাত্রা পায়। প্লেটোর রচনা সাক্ষ্য দেয়, এসব দার্শনিকের কারো কারো সাথে সক্রেটিসের মুখোমুখি দেখা হয়েছিল। অ্যানাক্সাগরাস ও তাঁর ছাত্র আর্কেলাউস সম্ভবত ছিলেন সক্রেটিসের সরাসরি শিক্ষক। তাই সক্রেটিসের দার্শনিক পটভূমিটি বুঝতে হলে সক্রেটিসপূর্ব দর্শন ও দার্শনিকদের বিষয়ে আমাদের জানতে হবে।

সক্রেটিস ইতিহাসের সবচেয়ে খ্যাতিমান দার্শনিক। সে খ্যাতির পেছনে আছে তাঁর ছাত্র প্লেটোর রচনাবলি। সক্রেটিস থেকে প্লেটো, প্লেটো থেকে অ্যারিস্টটল—গুরু-শিষ্য এই পরম্পরা ধরেই প্রাচীন গ্রিক দর্শনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা। গ্রিসের প্রাচীন দর্শনের ইতিহাস-বর্ণনা অনেক সময়ই শুরু হয় সক্রেটিসকে দিয়ে। এর একটি কারণ—সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকদের অনেকের সম্পর্কেই খুব ভালো করে কিছু জানা যায় না; তাঁদের রচনাগুলোর বেশিরভাগই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পরবর্তী কালের বিভিন্ন দার্শনিকের রচনায় তাঁদের রচনা ও মতবাদ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়; কারো-কারো রচনার উদ্ধৃতিও মেলে। এসব থেকেই, ধীরে ধীরে, সক্রেটিসপূর্ব দর্শন ও দার্শনিকদের

ওপর চর্চার শুরু; আর তা থেকে অতিপ্রাচীন এই দার্শনিকদের ধ্যান-ধারণা বিষয়ে আমরা যা জানতে পারি, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। প্রাচীন গ্রিসে সক্রেটিস-উত্তর যে দর্শনচর্চা, তা থেকে সক্রেটিসপূর্ব দর্শনচর্চা অনেকটাই আলাদা; অনেক সময়, তা অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক, নিজস্ব শক্তিতে অনেক বেশি ভাস্বর।

বাংলা ভাষায় সক্রেটিসপূর্ব দর্শন ও দার্শনিকদের নিয়ে সম্ভবত খুব বেশি লেখা হয়নি। বাংলাভাষী অনেক পাঠকের কাছে বিষয়টি হয়তো নতুন। তাঁদের জ্ঞানপিপাসা কিছুটা মিটলে, আর এ বিষয়ে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেলে, এই রচনা সার্থক হয়ে উঠবে।

**আহমেদ খালেদ**

ফেব্রুয়ারি, ২০১৩
ঢাকা

## প্রথম অধ্যায়

# সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যু

### ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

ইতিহাসের পাতায় খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৩৯৯ সনটি চিহ্নিত হয়ে আছে বিশেষভাবে। ওই সালেই, প্রাচীন গ্রিসের এথেন্স নগরীতে, গণ-আদালতের রায় মেনে, হেমলকের বিষ পান করে মৃত্যুবরণ করেন সক্রেটিস। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর বছর।

গ্রিসের প্রাচীন সভ্যতার বিস্তৃতি ছিল পুরো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে। এর পূর্বভাগে ছিল ঈজিয়ান সাগর[১] ও ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ[২], আর এশিয়া মাইনরের প্রান্তভাগ—যার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নাম ছিল আয়োনিয়া[৩]। আর, পশ্চিমদিকে, আয়োনীয় সাগর[৪] পেরিয়ে, এ সভ্যতা ইতালি ও সিসিলি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সুদূর স্পেন পর্যন্ত।

গ্রিসের মূল ভূখণ্ড অসমতল, পাহাড়-পর্বতে ঘেরা। সেইসঙ্গে, সাগরের উপকূল ঢুকে পড়েছে এই ভূখণ্ডের যেখানে-সেখানে। ফলে, বিভিন্ন উপত্যকার জনবসতিগুলো, যোগাযোগ-ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে, গড়ে উঠেছিল বিচ্ছিন্নভাবে। এসব জনবসতির ছিল নিজস্ব অর্থনীতি, নিজস্ব শাসনব্যবস্থা, সেইসঙ্গে নিজস্ব ভাষারীতি-সংস্কৃতি-ধর্মবিশ্বাস। প্রতিটি লোকালয় গড়ে উঠেছিল একটি কি দুটি শহরকে কেন্দ্র করে; আর এ শহরগুলোকে ঘিরে ছিল পাহাড়ের ঢাল ও উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কৃষিজমি। এমনি এককেটি নগররাষ্ট্র ছিল : ইউবোয়া, লক্রিস, এটোলিয়া, ফোকিস, বোয়েশিয়া—এমনি আরো অন্যান্য।[৫]

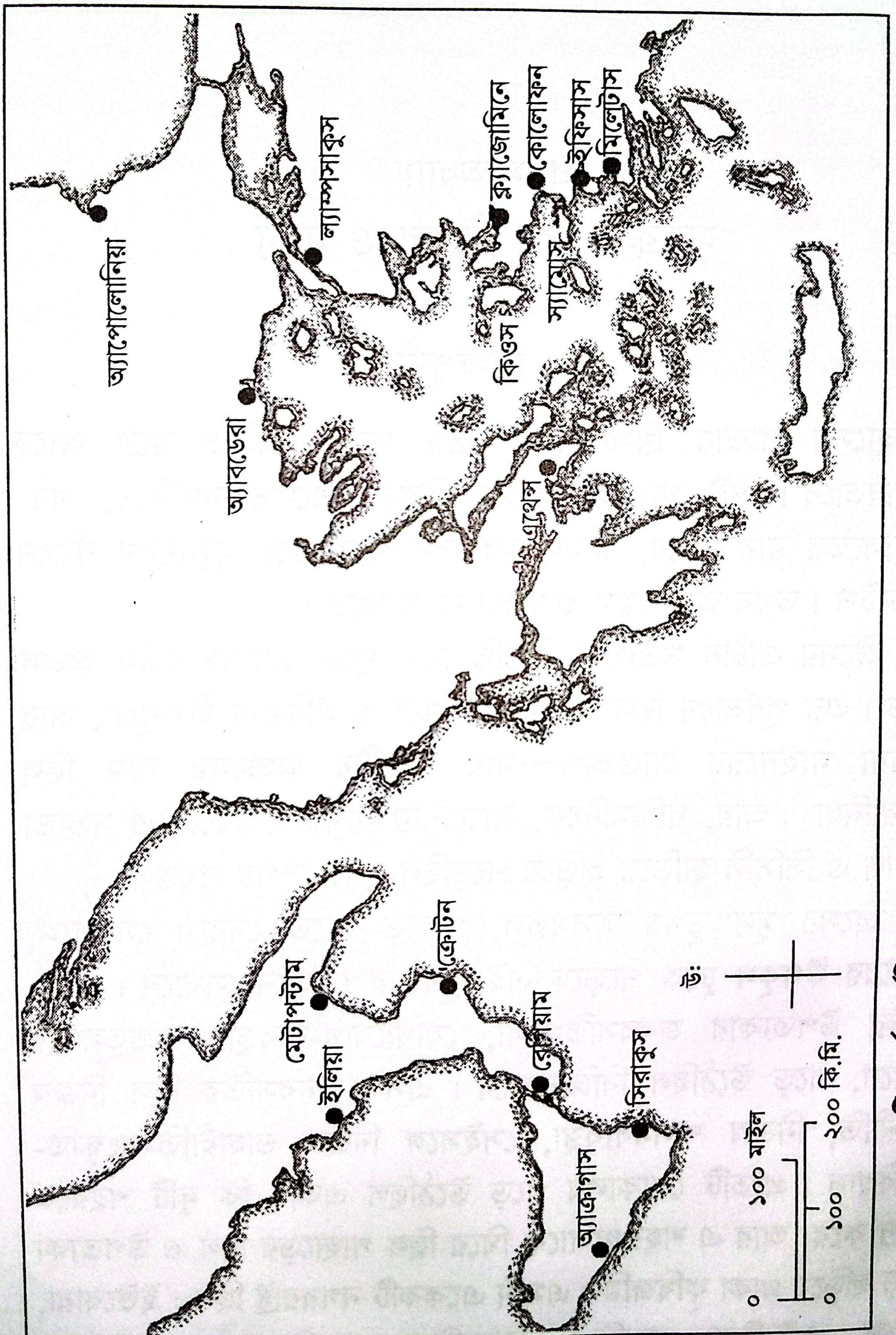


সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকদের জন্মস্থান ও বিচরণক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত প্রাচীন গ্রিক নগরসমূহ

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, এদের মধ্যে, দুটি নগররাষ্ট্রের প্রাধান্যই ছিল বেশি। এদের একটি : ল্যাকোনিয়া[৬], যার রাজধানী ছিল স্পার্টা। আর অন্যটি : অ্যাটিকা[৭], যার রাজধানী ছিল এথেন্স।

এথেন্স ও স্পার্টা—এ শহরদুটির মধ্যে বরাবরই ছিল একরকম রেষারেষি আর শত্রুতার সম্পর্ক। কেবল একবারই তারা একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল : যখন পারস্যসম্রাট দারায়ুস[৮] এবং তাঁর ছেলে জেরেক্সেস[৯] গ্রিস আক্রমণ করে। ৪৯০ থেকে ৪৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী পারস্যযুদ্ধে স্পার্টা সরবরাহ করেছিল সৈন্যদল, আর এথেন্স পাঠিয়েছিল নৌবহর। বিশ-বছর-মেয়াদি যুদ্ধ শেষে স্পার্টা তার সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়েছিল স্বভূমে; যুদ্ধের ধাক্কা সামাল দিতে গিয়ে তার অর্থনীতি হয়ে পড়েছিল দুর্বল। অন্যদিকে, পারস্যযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, এথেন্স তার নৌবাহিনীকে নিয়োগ করে বাণিজ্যের কাজে; ফলশ্রুতিতে, কিছুদিনের মধ্যেই এথেন্স পরিণত হয় সে সময়ের অন্যতম শক্তিশালী বাণিজ্যনগরীতে। অর্থনৈতিক পরাক্রমের সাথে সাথে এথেন্স নগরী হয়ে ওঠে শিল্প, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। আর, স্পার্টা আটকে থাকে কৃষি অর্থনীতি ও সনাতন ধ্যানধারণার বেড়াজালে।

এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয় খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৫ থেকে ৪৩১ সাল পর্যন্ত সময়কালকে। এ সময়ে এথেন্সের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন পেরিক্লিস[১০]। তাঁরই নেতৃত্বে প্রাচীনকালের অন্যতম সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে মাথা তোলে এথেন্স। সমৃদ্ধির এই যুগের অবসান ঘটে যখন, ৪৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, স্পার্টার সাথে পেলোপোনেসীয় যুদ্ধে[১১] জড়িয়ে পড়ে এথেন্স।

পেরিক্লিসের উদারনৈতিক শাসনকেও, মাঝে মাঝেই, বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিরোধীদের মধ্যে যেমন ছিলেন ডানপন্থী সম্ভ্রান্তবংশীয়রা, তেমনি ছিলেন বামধারার গণতন্ত্রপন্থীরাও। স্পার্টার সাথে যুদ্ধ বাধবার পরপর, এথেন্সের ঐক্য রক্ষার খাতিরেই, এ দুটি পক্ষ পারস্পরিক সংঘর্ষ থেকে বিরত ছিল। এথেন্সের শাসনব্যবস্থা ছিল মূলত

গণতান্ত্রিক; এর অর্থনীতি ছিল বাণিজ্য ও শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, স্পার্টায় বহাল ছিল সামরিক- ও স্বৈরতন্ত্র, আর এর অর্থনীতি ছিল কৃষিপ্রধান। এথেন্সের সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের অনেকেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চেয়ে স্পার্টার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বেশি পছন্দ করতেন। পেলোপোনেসীয় যুদ্ধে এথেন্সের পরাজয়ের পরপর, স্পার্টার শাসকদের আনুকূল্যে, এ রকমই তিরিশজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় নেতা ক্ষমতার দখল নেন।[১২] এই নেতাদের কেউ কেউ ছিলেন সক্রেটিসের ছাত্র।

তিরিশ নেতার এই শাসন স্থায়ী হয়েছিল মাত্র এক বছর। গণতন্ত্রীরা পুনরায় ক্ষমতা দখলের পর, ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে, এথেন্সের গণ-আদালতে অভিযোগ আনা হয় সক্রেটিসের বিরুদ্ধে। বিচারে সক্রেটিস দোষী সাব্যস্ত হন। আদেশ হয় তাঁর মৃত্যুদণ্ডের।

## 'সবার চেয়ে সেরা মানুষ'

কেমন মানুষ ছিলেন সক্রেটিস?

দেখতে সুদর্শন ছিলেন না মোটেও। প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনে তাঁর সম্পর্কে যেটুকু জানা যায়, আর প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্র থেকে তাঁর চেহারার যে আভাস মেলে—তা থেকে এমন ধারণাই করতে হয়। গোলগাল, কিছুটা মোটাসোটা। টাক-মাথা। সেইসঙ্গে থ্যাবড়া নাক। মোটের ওপর চেহারাটা তাঁর আকর্ষণীয় ছিল না একেবারেই। তার পরও, সেই সময়ের এথেন্সের তরুণ-যুবকেরা এসে ভিড় জমাচ্ছিল তাঁর চারপাশে, পেতে চাইছিল তাঁর সান্নিধ্য, শুনতে চাইছিল তাঁর কথা।

সমাজের নানা শ্রেণী থেকে আসছিল এ সকল তরুণ। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্লেটো[১৩] ও অ্যালসিবিয়াডেসের[১৪] মতো ধনী-বংশের ছেলেরা; সক্রেটিসের মুখে এথেনীয় গণতন্ত্রের ব্যঙ্গাত্মক বিশ্লেষণ শুনে মজা পেতেন এঁরা। ছিলেন অ্যান্টিসথেনেসের[১৫] মতো সমাজতন্ত্রী; সক্রেটিসের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনই আকর্ষণ করে এনেছিল এঁকে। ছিলেন, এমনকি, অ্যারিস্টিপ্পাসের[১৬] মতো সব কিছুতে বিশ্বাস হারানো এক যুবক;

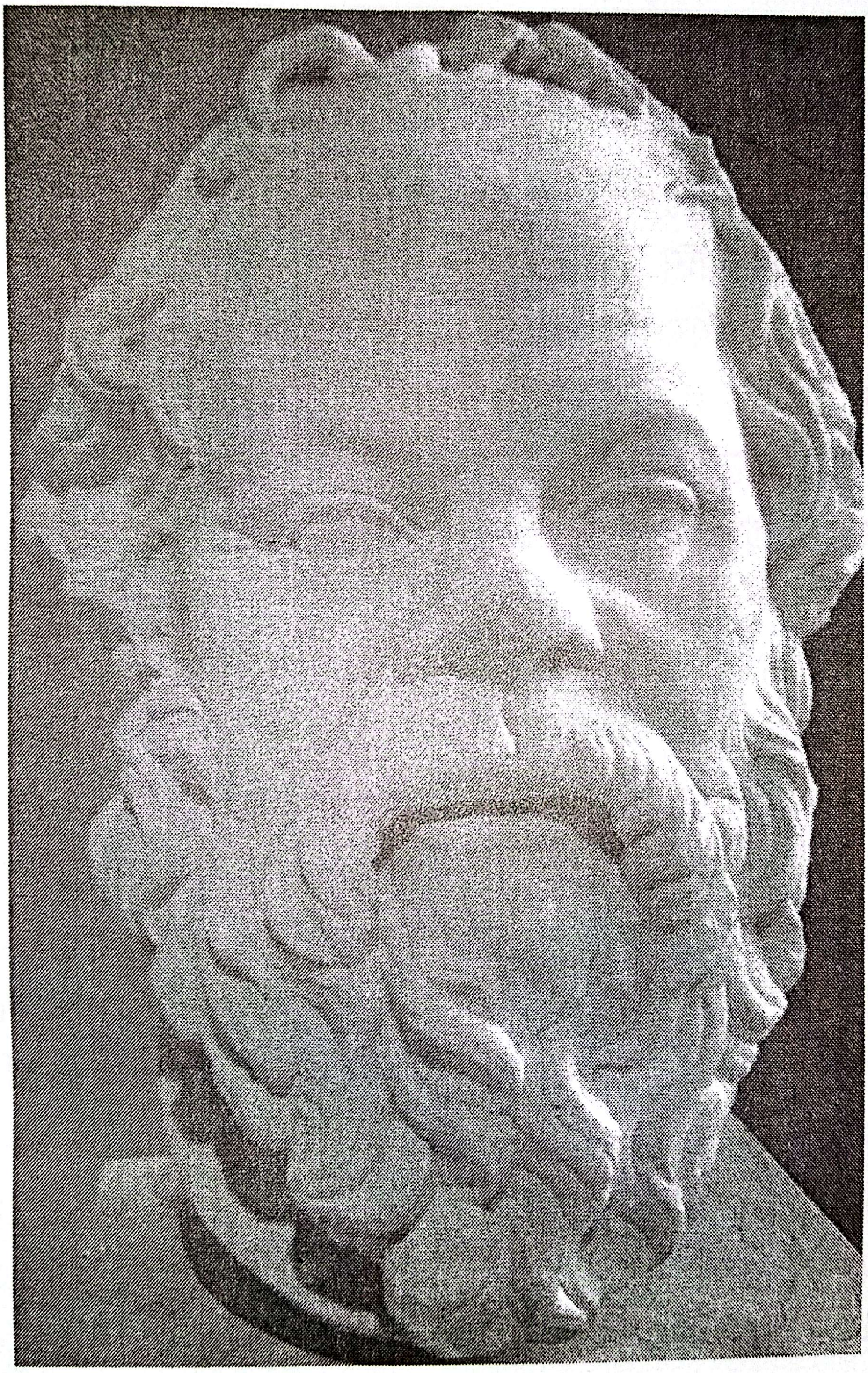

সক্রেটিস (খ্রি.পূ. ৪৬৯ – ৩৯৯)

সমাজকে পুরোপুরি ঢেলে সাজানোয় বিশ্বাস করতেন ইনি, স্বপ্ন দেখতেন এমন এক পৃথিবীর যেখানে সব মানুষই হয়ে উঠবে সক্রেটিসের মতো মুক্তমনা।

কোন আকর্ষণে সক্রেটিসের কাছে ছুটে আসছিল এ সকল তরুণ-যুবক? মূল একটি কারণ হয়তো ছিল—অসাধারণ একজন দার্শনিক হবার পাশাপাশি, মানুষ হিসেবেও সক্রেটিস ছিলেন অনন্য। অত্যন্ত সহজ-সরল, সাদামাটা জীবনযাপন করতেন তিনি। সাহসীও ছিলেন খুব : নিজের জীবন বিপন্ন করে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বাঁচিয়েছিলেন অ্যালসিবিয়াডেসের। আর, সক্রেটিসের অন্য যে বৈশিষ্ট্যটি মুগ্ধ করত তরুণদের, তা তাঁর জ্ঞানের নম্রতা, তাঁর নিরহংকারী বিনয়। নিজেকে কখনোই জ্ঞানী বলে দাবি করতেন না তিনি। বলা হয়ে থাকে, ডেলফি মন্দিরের 'ওর‍্যাক্‌ল'[১৭] গ্রিকদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ হিসেবে ঘোষণা করেছিল সক্রেটিসের নাম। এ ঘোষণাকে, শেষপর্যন্ত, মেনে নিয়েছিলেন সক্রেটিস; কিন্তু, সেইসঙ্গে, বলেছিলেন এ কথাও : 'আমি একটা জিনিসই শুধু জানি, তা হচ্ছে—আমি কিছুই জানি না।'[১৮] দর্শনের আরম্ভ সেখানেই, যেখান থেকে মানুষ প্রশ্ন করা শুরু করে। বিশেষ করে যখন সে প্রশ্ন করে তার নিজের বিশ্বাস, সংস্কার ও ধ্যান-ধারণাগুলোকে। এসব বিশ্বাস আর ধারণার আপাত অভ্রান্তির পেছনেই কখনো কখনো ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজস্ব লোভ, নিজস্ব স্বার্থ। দর্শন কখনোই সত্য হয়ে ওঠে না যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার নিজের মনকে খতিয়ে না দেখে। যেমন বলেছিলেন সক্রেটিস : 'নিজেকে জানো।'[১৯]

এথেন্সের বাজারে, পথেঘাটে নানা মানুষকে, নানা সময়ে, আত্মসমীক্ষণে প্ররোচিত করতেন সক্রেটিস। শেখাতে চাইতেন কীভাবে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতে হয়। কেউ যদি জোরালোভাবে ন্যায় ও অন্যায় বিষয়ে কথা বলত, নিরীহ গলায় জানতে চাইতেন কাকে বলে 'ন্যায়'? বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রয়োজনে, মানুষ বিমূর্ত যে সকল ধারণাকে শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে, নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করে

চলে—শব্দের আড়ালের ওই ধারণাগুলোকেই প্রশ্নের শরে বিদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন সক্রেটিস। সম্মান কাকে বলে? মানবগুণ কাকে বলে? নীতি কী? মানবসত্তা কী? দেশপ্রেম কী? কেমন রাষ্ট্র চাই?

অবিরাম প্রশ্নের এই বাণে, একসময়, নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনলেন তিনি। যুদ্ধের সময় সেটা। রাষ্ট্রের যেকোনো রকম সমালোচনা করাই বিপজ্জনক। তার ওপর, যে-সময়ে গণতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার নানা অসংগতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি, তরুণদের উদ্বুদ্ধ করছিলেন নিজেদের চিন্তায় ওইরকম অজস্র অসংগতিকে চিহ্নিত করতে, সেগুলো পরিহার করতে—সেই একই সময়ে, সম্ভ্রান্ত বংশের কিছু নেতা গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। কারমিডেস[২০], ক্রিটিয়াস[২১], অ্যালসিবিয়াডেসের মতো, এঁদের কেউ কেউ ছিলেন সক্রেটিসের সরাসরি ছাত্র। যুদ্ধে স্পার্টার কাছে এথেন্সের পরাজয়ের পরপর, ক্ষমতার দখল নেন এঁরা। কিন্তু, সে অভ্যুত্থান সফল হতে পারেনি। মাত্র এক বছরের মাথায় পতন হয় 'তিরিশ নেতার শাসন'। আর, এঁদের হটিয়ে, গণতন্ত্রপন্থীরা আবার যখন ক্ষমতায় ফেরেন, তখনই অভিযোগ আনা হয় সক্রেটিসের বিরুদ্ধে। সন্দেহ করা হয়, ব্যর্থ ওই অভ্যুত্থানের মূল ইন্ধনদাতা তিনি। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে যে অভিযোগ আনা হয়, তাতে বলা হয় : সক্রেটিস অধার্মিক; এথেন্সের প্রচলিত দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস নেই তাঁর; আর, এথেন্সের তরুণ প্রজন্মকে তাঁর দর্শনচর্চার মাধ্যমে বিভ্রান্ত করছেন তিনি, ঠেলে দিচ্ছেন বিপথে। ফলে, কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় সক্রেটিসকে। বিচারে মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত হয় তাঁর।

সক্রেটিসের বিচারের সময়ে প্লেটোর বয়স ছিল আটাশ। বিশ বছর বয়স থেকে, একটানা আট বছর, সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন প্লেটো। আর, আরো অনেক ছোট বয়স থেকেই সক্রেটিসকে তাঁদের পরিবারের বন্ধু হিসেবে চিনতেন। পরবর্তীতে, সক্রেটিসের এই বিচারের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন প্লেটো তাঁর *অ্যাপলজি*[২২] শীর্ষক 'ডায়ালগ'টিতে। বিচারের পুরো

সময়টাতেই বিচারস্থলে উপস্থিত ছিলেন তিনি। আর উপস্থিত ছিলেন সক্রেটিসের অন্তিম মুহূর্তেও : কারাগারের নিভৃত কক্ষে যখন হেমলকের পেয়ালা তুলে চুমুক দিচ্ছিলেন সক্রেটিস। হৃদয়বিদারক সেই অন্তিমদৃশ্যের বর্ণনা আছে প্লেটোর *ফিডো*[২৩] নামের ডায়ালগটিতে। এই ডায়ালগেরই শেষ বাক্যে মথিত হয়ে আছে পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের জীবনাবসানের পরপর এক ছাত্রের বুক চিরে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাস : 'এভাবেই চলে গেলেন আমাদের বন্ধু; সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, তিনি ছিলেন আমার দেখা সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে ন্যায়বান—সবার চেয়ে সেরা মানুষ।'[২৪]

## দর্শনের উত্থান

পেলোপোনেসীয় যুদ্ধে স্পার্টার কাছে পরাজয়ের সাথে সাথে, রাজনৈতিকভাবে অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এথেন্স। পেরিক্লিসের সেই সোনালি যুগের গৌরব আর কখনোই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু, দর্শনচর্চার কেন্দ্র হিসেবে এথেন্সের গুরুত্ব ক্রমাগতই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সক্রেটিসের সঙ্গে দেখা ও পরিচয় হওয়াটা ছিল প্লেটোর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এথেন্সের এক অভিজাত বংশের সন্তান ছিলেন প্লেটো। ছিলেন বলিষ্ঠ শরীরের অধিকারী; কম বয়সেই ক্রীড়াবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু, সুন্দর দেহসৌষ্ঠবের আড়ালে লুকিয়ে ছিল সংবেদনশীল ও মেধাবী এক মন। সক্রেটিসের সংসর্গে এসে, যুক্তির সৃষ্টিশীল খেলায় মেতে ওঠে সে মন; জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে শেখে চারপাশের সমস্ত কিছুর দিকে—সর্বোপরি, নিজের সত্তার অভ্যন্তরে। শিক্ষাগুরু সম্পর্কে নিজেই বলেছেন প্লেটো : 'আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি, কারণ আমার জন্ম হয়েছিল গ্রিসে; আমি পরাধীন নই, স্বাধীন; আমি একজন পুরুষ; আর, সর্বোপরি, আমি জন্মেছি এমন এক সময়ে, যখন সক্রেটিসের মতো শিক্ষাগুরু ছিলেন।'[২৫]

বা এখানে আসত শিক্ষা নিতে। অনেকটা মধ্যযুগ ও শ্ববিদ্যালয়গুলোর আদলে গড়ে ওঠে এ শিক্ষায়তনটি। ছিল পরবর্তী প্রায় নয়শ বছর।[২৮]

ত্র ছিলেন প্লেটো; আবার প্লেটোর ছাত্র অ্যারিস্টটল। য়, পরবর্তী প্রজন্মের আরো-আরো দার্শনিকের হাত নের ধারাটি গড়ে ওঠে। এ ধারার জন্ম হয়েছিল । কিন্তু সক্রেটিসের আগেও গ্রিসে দর্শনের চর্চা ছিল। ক ধারাবাহিকতায়, ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটেই এথেন্স হয়েছিল সক্রেটিসের মতো যুক্তিবাদী আর বাগ্মী এক

সক্রেটিসের এ সকল পূর্বসূরি? কাদের হাতে জন্ম সের দর্শনশাস্ত্র?

বংশের ছেলেমেয়ে আধুনিককালের বিশ আর, এর স্থায়িত্ব ছি

সক্রেটিসের ছ এই ধারাবাহিকতায় ধরে পশ্চিমা দর্শনে সক্রেটিসের হাতে। দর্শনচর্চার ভিন্ন এ নগরীতে আবির্ভাব হ চরিত্রের।

কারা ছিলেন নিয়েছিল প্রাচীন গ্রি

দ্বিতীয় অধ্যায়

# গ্রিক দর্শনের জনক

## একটি সূর্যগ্রহণ

বলা হয়, গ্রিক দর্শনের জন্ম হয়েছিল ৫৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ২৮ মে। কারণ, প্রাচীন গ্রিসের এক দার্শনিক আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ওই সময়েই ঘটবে পরবর্তী সূর্যগ্রহণ। প্রাচীন গ্রিসের ওই দার্শনিকের নাম থ্যালেস[১]। আর, তাঁকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয় গ্রিসের প্রথম দার্শনিক হিসেবে।

প্রশ্ন আসে, সূর্যগ্রহণের সাথে দর্শনের সম্পর্ক কী?

সম্পর্কটা আসলে পর্যবেক্ষণের, সেইসঙ্গে যুক্তির প্রয়োগের। এ দুয়েরই সম্পর্ক আছে দর্শনের সাথে; সেইসঙ্গে, বিজ্ঞানের সাথেও। থ্যালেস সেই অর্থে গ্রিসের প্রথম বিজ্ঞানীও। আর, সত্যিকার অর্থে, প্রাচীনকালে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সে রকম কোনো ভেদরেখা ছিল না। প্রাচীন সব দার্শনিকই সে অর্থে বিজ্ঞানী। বিশেষ করে, সক্রেটিসপূর্ব আদি দার্শনিকদের বেলায় এ কথা প্রযোজ্য আরো বিশেষভাবে। কারণ তাঁদের প্রায় সকলেরই জিজ্ঞাসা ঘুরে ফিরেছে বস্তুজগৎ-সৃষ্টির কার্যকারণ ও উৎসের সন্ধানে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুর দিকে, প্রাচীন গ্রিসে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একরকম চর্চা ছিল। সূর্যগ্রহণ বিষয়ে থ্যালেসের ভবিষ্যদ্বাণীতেই তার প্রমাণ মেলে। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে ছিল ব্যাবিলন। প্রতিদিনের সময়কে চব্বিশ ঘণ্টায় ভাগ করে হিসাব করার প্রথা ব্যাবিলনীয়রাই প্রথম প্রচলন করে।

বৃত্তের অন্তঃস্থ কোণকে ৩৬০ ভাগে ভাগ করার কৃতিত্বও তাঁদের। সেইসঙ্গে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণকে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে এ দুই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার সক্ষমতাও অর্জন করে তাঁরা। ব্যাবিলনীয়দের এই বিশেষ জ্ঞানটুকু অর্জন করেছিলেন থ্যালেসও। কারণ, এশিয়া মাইনরের যে শহরে তিনি বাস করতেন, তার সাথে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতাগুলোর বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

## মিলেটাস

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে, এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলের গ্রিক উপনিবেশগুলোর মধ্যে, অন্যতম সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে মাথা তুলেছিল মিলেটাস[২]। এ শহরেই বাস করতেন গ্রিক দর্শনের জনক থ্যালেস।

প্রাচীন গ্রিসে পরিশ্রমী ও উদ্যোগী হিসেবে মিলেসীয়দের[৩] সুনাম ছিল। বিশেষ করে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা ছিল রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য। আয়োনিয়ার পূর্ব দিকের এশীয় রাজ্যগুলোর সাথে বরাবরই সুসম্পর্ক ছিল মিলেটাসের, বিশেষ করে লিডিয়া[৪]-র সাথে; আর যোগাযোগ ছিল ব্যাবিলনের সঙ্গেও। পরবর্তীতে, মিশরের সঙ্গেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে তারা। এ ছাড়া, গ্রিসের উত্তরে থ্রেসে[৫] ও কৃষ্ণ সাগরে, সেইসঙ্গে এশিয়া মাইনরের দক্ষিণে বসফরাস প্রণালীর মুখে এবং দক্ষিণ ইতালিতেও মিলেসীয়রা উপনিবেশ স্থাপন করে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী জুড়ে, আয়োনিয়ার আর-সব শহরের মতো মিলেটাসেও রাজনৈতিক পরিস্থিতির নানা উত্থান-পতন চলছিল। বিশাল এক দাস শ্রেণীর ওপর দাঁড়িয়ে ছিল মিলেটাসের পুরো অর্থনীতি। আর, ধনী অভিজাত শ্রেণীর সাথে সাধারণ নাগরিকদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বও চলে আসছিল বহু বছর ধরে। প্রাথমিকভাবে এই নগরের ক্ষমতা ছিল জমিদার সামন্ত শ্রেণীর হাতে; পরে ক্ষমতার দখল নেন বণিকরা; আরো পরে, সাধারণ নাগরিকদের সমর্থনে, ক্ষমতার দণ্ড আসে স্বৈরনায়কদের

হাতে। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত, পারস্য সাম্রাজ্যের উত্থানের আগ পর্যন্ত, স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী এক নগর হিসেবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল মিলেটাস। অর্থনীতির পাশাপাশি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তাচর্চায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছিল মিলেটাসবাসী। তারই স্বাক্ষর—ষষ্ঠ শতকের শুরুতে এই নগরে দর্শনশাস্ত্রের উত্থান।

## একজন জ্ঞানী মানুষ

প্রাচীন গ্রিসের কিংবদন্তিতে সাতজন জ্ঞানী মানুষের কথা আছে। এঁদেরই একজন ছিলেন থ্যালেস। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৫ সালের সূর্যগ্রহণটি থেকেই তাঁর জীবৎকালের হিসাব করা হয়। ধারণা করা হয়, তাঁর জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৬২৫ সালে; আর খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। প্রাচীনকাল থেকেই তাঁর সম্পর্কে নানা প্রবাদ ও কাহিনী প্রচলিত ছিল। এগুলোর কোনটা কতটা সত্যি আর কতটা পরবর্তীকালের মানুষদের মনগড়া, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া মুশকিল।

বলা হয়, থ্যালেস মিশরে গিয়েছিলেন এবং মিশর থেকে জ্যামিতি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেন। পরবর্তীতে গ্রিসে জ্যামিতি ও গণিতের যে পূর্ণোদ্যম চর্চা শুরু হয়েছিল, তার প্রায় পুরোটা কৃতিত্ব দেওয়া হয় থ্যালেসকেই। পিরামিডের ছায়া থেকে পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয় করতে জানতেন তিনি; জানতেন, সাগরের তীরের দুটি বিন্দু থেকে দূরবর্তী জাহাজের দূরত্ব কী করে নির্ণয় করতে হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়েও চর্চা ছিল তাঁর। সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটি তারই প্রমাণ।

প্রথম বয়সে, সম্ভবত, মিলেটাসের কোনো উচ্চ শাসন-পদে বহাল ছিলেন থ্যালেস। পরবর্তী জীবনে, নিরিবিলি জ্ঞান সাধনায় মনোনিবেশ করেন তিনি। প্রচলিত এক কাহিনীতে বলা হয় : লিডিয়ার শাসক ক্রোসাস[৬] একবার মিলেটাস ভ্রমণে আসেন, কিন্তু তাঁর যাত্রাপথে একটি নদী পড়ে; থ্যালেস সে নদীর দিক পরিবর্তন করে ক্রোসাসকে মিলেটাসে নিয়ে আসেন। অ্যারিস্টটল তাঁর *পলিটিক্স* গ্রন্থে, থ্যালেস সম্পর্কে নিচের

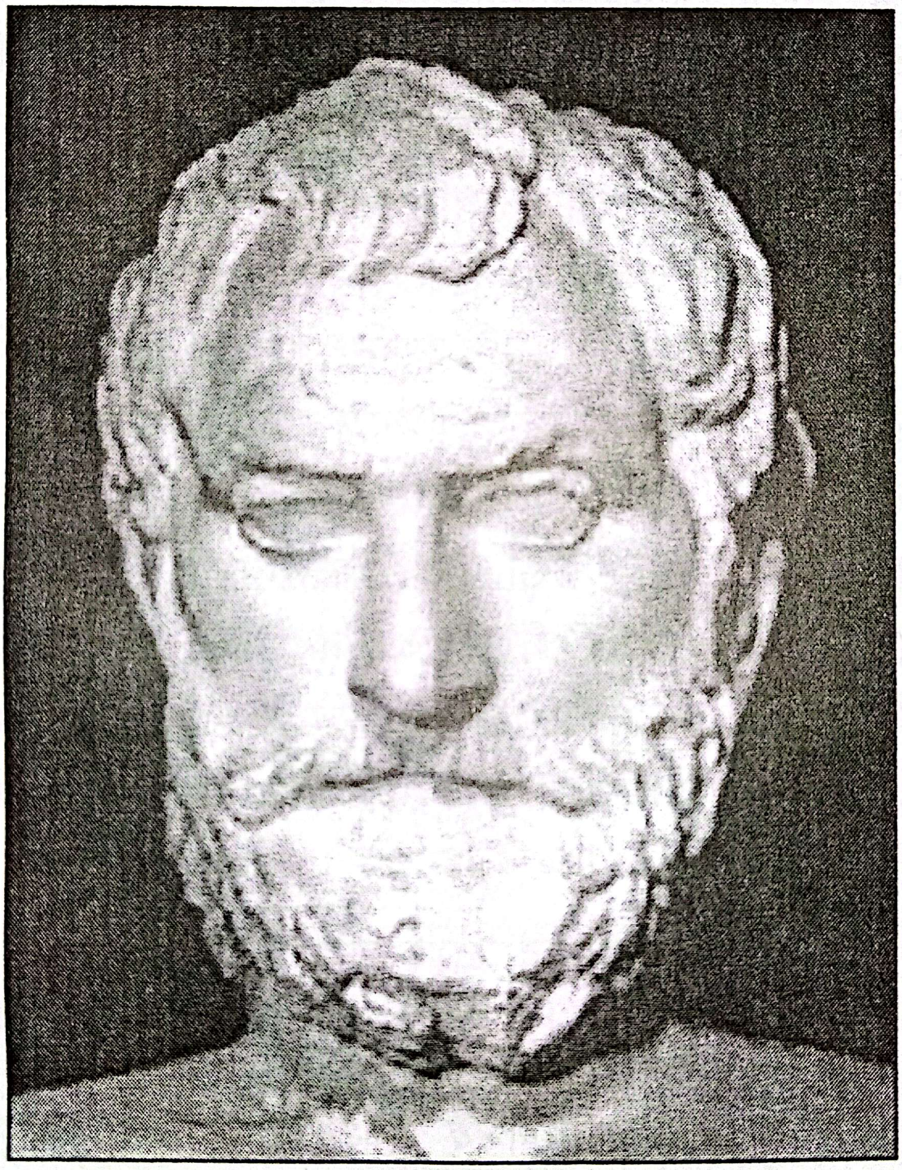

থ্যালেস (আনু. খ্রি.পূ. ৫৮৫)

গল্পটি বলেছেন।

থ্যালেস দরিদ্র জীবনযাপন করতেন। তাঁকে দেখিয়ে অন্যরা বলাবলি করত—দর্শনচর্চা করে কোনো লাভ হয় না, কারণ এতে টাকা-পয়সা আসে না। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে থ্যালেসের ভালো জ্ঞান ছিল; একবার গ্রহ-তারার হিসাব থেকে তিনি বুঝতে পারেন, পরের গ্রীষ্মে জলপাইয়ের বড় রকমের ফলন হবে। শীতকাল থাকতে থাকতেই, তাঁর হাতে যেটুকু টাকা ছিল তার সবটা দিয়ে মিলেটাস ও কিওসের[৭] জলপাইতেল-পেষার সব জাঁতি অগ্রিম ভাড়া নিয়ে রাখেন থ্যালেস। জলপাইয়ের 'বাম্পার' ফলন সম্পর্কে অন্যদের অগ্রিম ধারণা ছিল না, তাই এ ব্যাপারে আর কেউ উদ্যোগী হয়নি। সেবার গ্রীষ্মে, সত্যি সত্যিই, জলপাইয়ের দুর্দান্ত ফলন হলো; সঙ্গে সঙ্গে জলপাইতেল-পেষার জাঁতিগুলোর চাহিদা বেড়ে উঠল অনেক গুণ। থ্যালেস তখন তাঁর ইচ্ছামাফিক ওই জাঁতিগুলো চড়া দামে অন্যদের ভাড়া দিলেন। নিজের অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করে সেবার অনেক টাকা কামালেন থ্যালেস। 'এভাবে, তিনি জগৎকে দেখালেন—দার্শনিকরা চাইলেই টাকা উপার্জন করে ধনী হতে পারে। কিন্তু দার্শনিকদের জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন।'[৮]

## থ্যালেসের 'প্রাকৃতিক দর্শন'

থ্যালেসকে 'প্রাকৃতিক দর্শন'[৯]-এর জনক বলে উল্লেখ করেছেন অ্যারিস্টটল। তাঁর মতে, থ্যালেসই সর্বপ্রথম বস্তুজগতের সৃষ্টির আদি উৎস সম্পর্কে কথা বলেন। থ্যালেস বলেছিলেন, বস্তুজগতের সব কিছুর উৎপত্তি হয়েছে জল থেকে। সেইসঙ্গে, তিনি এ কথাও বলেছেন—পুরো পৃথিবী অবস্থান করছে জলের ওপর।

জগতের সমস্ত কিছুর উৎপত্তি জল থেকে—এমন-একটি ধারণা আজকের যুগে হয়তো হাস্যকর শোনাবে। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই ধারণা ছিল রীতিমতো বৈপ্লবিক। সবচেয়ে বড় কথা, থ্যালেস আর তাঁর পরবর্তী সকল 'প্রাকৃতিক দার্শনিক' জগৎ-সৃষ্টির কার্যকারণকে বুঝতে

চেয়েছিলেন নিরীক্ষণ ও যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। এটিই দর্শনের সূচনা; সূচনা বিজ্ঞানেরও। থ্যালেস ও তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের 'প্রাকৃতিক দার্শনিকরাই' ছিলেন ইতিহাসের প্রথম বিজ্ঞানী। আর, ভুললে চলবে না, খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বেশির ভাগ বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন, সকল পদার্থই হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত। আর, জলের দুই-তৃতীয়াংশই তো হাইড্রোজেন!

থ্যালেস আরো বলেছিলেন, বিশ্বজগৎময় বিস্তৃত আছে এক সত্তা, আর সে সত্তা ছড়িয়ে আছে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে। সেইসঙ্গে, তিনি বলেছিলেন, সকল বস্তুর মধ্যেই প্রাণ আছে। সম্ভবত, পদার্থের, বিশেষ করে লোহার, চৌম্বক গুণ অবলোকন করেই তিনি এমন ধারণায় আসেন। আর, এ ধারণার পেছনেও আছে যুক্তির প্রয়োগ : চলমানতা প্রাণেরই লক্ষণ, আর নির্জীব বস্তুও যখন গতিশীল হয়ে ওঠে তখন তার অন্তঃস্থ জীবনই নিশ্চয় সঞ্চার করে সে গতি।

থ্যালেস ও তাঁর মতবাদ সম্পর্কে আরো নানা কথা পরবর্তী গ্রিক ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের রচনায় পাওয়া যায়। সেসব তথ্যের অনেকটাই দর্শনের আধুনিক ইতিহাস-রচয়িতারা ভিত্তিহীন বলে বিবেচনা করেন। তবে, সব মিলে, বেশ রহস্যময় আর কিংবদন্তির এক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন থ্যালেস। তাঁর সম্পর্কে যতটা রটনা, তার চেয়ে সত্যিকার তথ্যের পরিমাণ অনেক কম। থ্যালেসের চাইতে, তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের অন্য দুই দার্শনিক এবং তাঁদের মতবাদ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ। আর, এ দুই 'প্রাকৃতিক দার্শনিক'ও ছিলেন মিলেটাসেরই অধিবাসী।

## তৃতীয় অধ্যায়
# আরো দুই মিলেসীয়

### দর্শনের মিলেসীয় ঘরানা

থ্যালেস এবং তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের দুজন দার্শনিকের চিন্তাভাবনা সক্রেটিসপূর্ব দর্শনের একটি বিশেষ ঘরানা[১] হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ ঘরানার নাম দেওয়া হয়েছে 'মিলেসীয় ঘরানা'[২]—কারণ, এ তিনজন দার্শনিকই বেশ কাছাকাছি সময়ে বসবাস করতেন মিলেটাস নগরে।

থ্যালেসের উত্তরসূরি ওই দুই দার্শনিকের নাম, যথাক্রমে, অ্যানাক্সিম্যান্ডার[৩] ও অ্যানাক্সিমেনেস[৪]। অ্যানাক্সিম্যান্ডার সরাসরি থ্যালেসের ছাত্র ছিলেন কি না সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তবে, থ্যালেসের মতবাদের সাথে তাঁর চিন্তাভাবনার ভালো মিল রয়েছে, আর তাঁরা দুজন কাছাকাছি সময়ে একই শহরে, অর্থাৎ মিলেটাসে, বসবাস করতেন। জানা যায়, ৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অ্যানাক্সিম্যান্ডারের বয়স ছিল চৌষট্টি বছর। আর, অ্যানাক্সিমেনেস সম্ভবত ছিলেন অ্যানাক্সিম্যান্ডারের সরাসরি ছাত্র; গুরুর মতবাদকে পুরোপুরি না মেনে, নিজস্ব যুক্তিতে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন।

প্রাচীন দর্শনের মিলেসীয় ঘরানাটি এই দার্শনিকদের মতবাদগুলোর জন্য যত না গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বজগৎকে বোঝার জন্য নিরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে তাঁরা যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন, সেই প্রচেষ্টার জন্য। এ প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছিল গ্রিক মানসের সঙ্গে প্রাচীন

মিশর ও ব্যাবিলনের ধ্যান-ধারণার সম্মিলনের ফলে। ওই সময়ে, মিলেটাস ছিল গ্রিসের অন্যতম সমৃদ্ধ বাণিজ্য-নগরী। বাণিজ্যের কারণেই বিভিন্ন জাতি-ধর্মের মানুষের সাথে মিলেসীয়দের যোগাযোগ হচ্ছিল। ফলশ্রুতিতে তাঁদের সনাতন ধর্মচিন্তা ও বিশ্বাসের আগল কিছুটা হলেও ঢিলা হয়ে আসছিল—আর জন্ম নিচ্ছিল নতুনকে জানবার আগ্রহ। থ্যালেস, অ্যানাক্সিম্যান্ডার ও অ্যানাক্সিমেনেস জগৎ ও সৃষ্টি বিষয়ে যেসব ভাবনাচিন্তা করেছিলেন, সেগুলোর সবই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ। তাঁরাই ছিলেন গ্রিসের তথা ইউরোপের প্রথম বিজ্ঞানী। তাঁদের এইসব চিন্তার সূত্র ধরেই পরবর্তীকালের দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা নতুনভাবে চিন্তা-বিকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন।

## অ্যানাক্সিম্যান্ডার

অ্যানাক্সিম্যান্ডারের জন্ম আনুমানিক ৬১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, আর মৃত্যু ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তাঁর পিতার নাম ছিল প্র্যাক্সিয়াডেস[৫]। দারুণ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁর। জানা মতে, তিনিই প্রথম মাটি দিয়ে পৃথিবীর ম্যাপ তৈরি করেন। তাঁর রচিত একটি গ্রন্থের নাম জানা যায় : *প্রকৃতি সম্পর্কে*[৬]। তাঁর ধারণা ছিল—পৃথিবীর আকার গোলাকার একটি স্তম্ভের মতো, যার দৈর্ঘ্য প্রস্থের চেয়ে তিন গুণ; আর সূর্য হচ্ছে আগুনের একটি চক্র, যা আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে সাতাশ কিংবা আটাশ গুণ বড়; আর চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে বড় প্রায় সতেরো গুণ।

অ্যানাক্সিম্যান্ডার বিশ্বাস করতেন, বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে একটি একক উপাদান বা উৎস থেকে। কিন্তু, থ্যালেস যেমন বলেছেন সৃষ্টির মূল উপাদান জল, তা মানতে রাজি নন তিনি। আর, আমাদের চেনাজানা কোনো পদার্থকেই মূল উপাদান হিসেবে মানতে তিনি নারাজ। তাঁর মতে, সৃষ্টির উৎস অসীম, অজর ও অনন্ত। সমস্ত জগৎগুলোকে এই অসীম ধারণ করে আছে; আমাদের নিজস্ব জগৎ ছাড়াও আরো-আরো

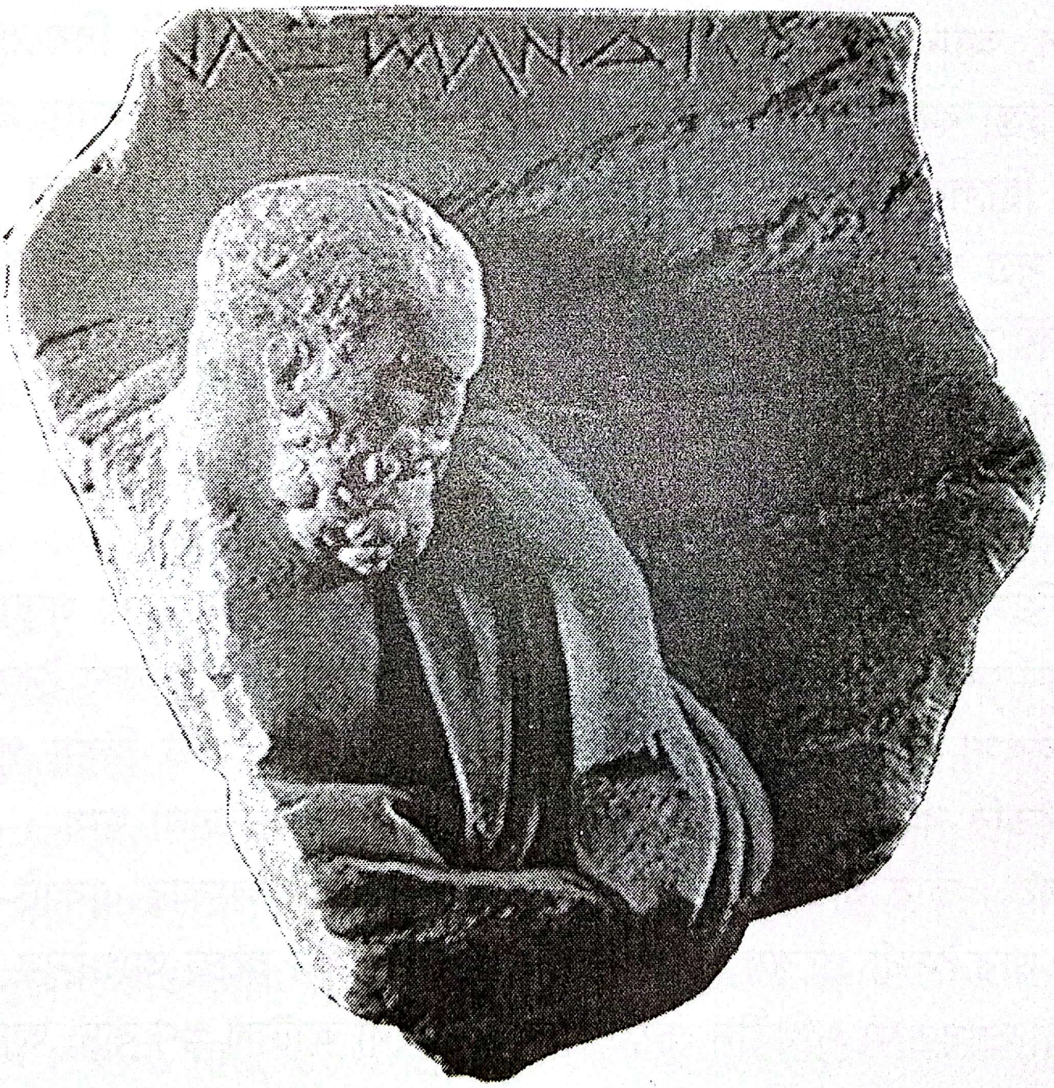

অ্যানাক্সিম্যান্ডার (খ্রি.পূ. ৬১০-৫৪০)

জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন তিনি। এই মূল উপাদান থেকেই আমাদের চেনা উপাদানগুলোর উৎপত্তি হয়েছে; আর, বস্তুজগতের উপাদানগুলো একটি আরেকটিতে রূপান্তরিত হতে পারে। এই রূপান্তর সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাষ্যের ছিন্ন এক অংশ কালের কৃপায় টিকে আছে আজও; এটিই পশ্চিমের কোনো দার্শনিক রচনার আদি নিদর্শন :

'যেখান থেকে সকল বস্তুর উৎপত্তি, সেখানেই আবার তারা, পূর্বনির্ধারিতভাবে, মিলিয়ে যাবে—একে অন্যের প্রতি সব অন্যায়ের হিসাব চুকিয়ে, সময়ের আদেশ মেনে।'[৭]

ন্যায়ের একরকম ধারণা গ্রিক ধর্মবিশ্বাসে ও দর্শনে দেখা যায়, যা একই সঙ্গে মানবীয় ও বিশ্বজাগতিক। আধুনিক মানসে ন্যায়ের এমন এক ধারণাকে বুঝে উঠতে পারা কঠিন। 'ন্যায়'[৮] শব্দের ব্যবহারও হয়তো এখানে পুরোপুরি সঠিক নয়; তারাপরও, এ শব্দ ছাড়া আর-কোনো শব্দ দিয়েই ধারণাটাকে পূর্ণাঙ্গভাবে বোঝানো যাবে না। অ্যানাক্সিম্যান্ডার এখানে যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা অনেকটা এ রকম : জগতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে, নির্দিষ্ট অনুপাতে আগুন, মাটি ও পানি আছে। এই উপাদানগুলো (এদের প্রত্যেকটির ওপরই দেবত্ব আরোপ করে কল্পনা হতো) একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে, সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। কিন্তু, এমন এক প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, যা ক্ষমতা- বা প্রভাব-বিস্তারের এই টানাপোড়েনের মধ্যে সমতা বিধান করে। যেমন, আগুন একসময় ছাইয়ে পরিণত হয়, আবার ছাই পরিণত হয় মাটিতে। ন্যায়ের এই ধারণা গ্রিক-মানসের গভীরতম বিশ্বাসগুলোর একটি। এ বিশ্বাস-মতে, জগতে সাম্যের এক চিরকালীন বিধান আছে, যে সাম্যের সীমারেখা অতিক্রম করা মানুষ বা দেবতা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর, ন্যায়ের এই ধারণা অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক—বিশ্বজগৎব্যাপী ক্ষমতাধর কোনো সত্তা বা ঈশ্বর হিসেবে গ্রিকরা একে দেখত না, দেখত অলঙ্ঘ্য এক নিয়ম বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে।

জগৎ-সৃষ্টির মূল উপাদান যে জল বা জলের মতো আর কোনো

পদার্থ হতে পারে না, এর যুক্তি হিসেবেও অ্যানাক্সিম্যান্ডার ন্যায় ও নিরপেক্ষতার কথাই বলেছেন। তাঁর মতে, জগতের কোনো একটি উপাদান যদি মূল উপাদান হতো, তবে সেটি আর-সব উপাদানকেই বিনষ্ট করে ফেলত। অ্যারিস্টটল তাঁর রচনায় অ্যানাক্সিম্যান্ডারের এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে : জগতের উপাদানগুলো একটি অন্যের ওপর ক্ষমতা বিস্তারের অবিরাম প্রচেষ্টায় লিপ্ত। বায়ু ঠাণ্ডা, জল আর্দ্র এবং আগুন তপ্ত। 'ফলে, এদের কোনো একটি যদি অসীম হতো, তবে বাকি উপাদানগুলোর আর অস্তিত্বই থাকত না।'[৯] কাজেই, বিশ্বজাগতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মূল উপাদানকে হতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

অনন্তময় গতির মধ্য থেকে বিশ্বজগতের উত্থান। বিশ্বজগৎকে সৃষ্টি করা হয়নি, বরং তা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে আজকের এই চেহারা পেয়েছে। অ্যানাক্সিম্যান্ডারের মতে, প্রাণিজগতের উদ্ভবও হয়েছে বিবর্তনের মাধ্যমে : জীবিত সকল প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে জল থেকে—সূর্যের তাপে জল শুকিয়ে আসার পর। আর, অন্যান্য প্রাণীর মতো, মানুষও বিবর্তিত হয়েছে মাছ থেকে। মানুষের বিবর্তনের পেছনেও জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি : মানবশিশু জন্মের পরবর্তী দীর্ঘ সময় মা-বাবার ওপর নির্ভরশীল থাকে; যদি চিরকালই এমন অবস্থা থাকত, তবে এতদিনে মানুষের অস্তিত্বই সম্পূর্ণ লোপ পেত।

যুক্তির অসামান্য ব্যবহার আর মেধাবী মননের ছটায় আজও ভাস্বর অ্যানাক্সিম্যান্ডারের নাম। মিলেসীয় ঘরানার তিনজন দার্শনিকের মধ্যে তাঁর ভাবনাচিন্তায় আধুনিক-মনস্কতার ছাপ সবচেয়ে বেশি। তবে, প্রাচীনকালে, বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্মের দার্শনিকদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কদর বেশি ছিল তাঁর শিষ্য অ্যানাক্সিমেনেসের।

## অ্যানাক্সিমেনেস

অ্যানাক্সিমেনেস ছিলেন অ্যানাক্সিম্যান্ডারের সমসাময়িক। ৫৪৭-৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি মিলেটাস নগরে বসবাস করতেন।

অ্যানাক্সিমেনেস (আনু. খ্রি.পূ. ৫৪৬)

তাঁর পিতার নাম ইউরিস্ট্র্যাটাস[১০]। বয়সে তিনি ছিলেন তরুণতর; ধারণা করা হয়, তিনি অ্যানাক্সিম্যান্ডারের সরাসরি ছাত্র ছিলেন। গুরুর দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোকে পূর্ণতর রূপ দেবার চেষ্টা করেন তিনি। অ্যানাক্সিম্যান্ডারের ভাষা ছিল কাব্যিক; আর, অ্যানাক্সিমেনেস লিখতেন অপেক্ষাকৃত সাদামাটা 'আয়োনীয় শৈলী'[১১]-র ভাষায়।

অ্যানাক্সিমেনেসের মতে, বস্তুজগতের উৎপত্তি বায়ু থেকে। এ বায়ু অসীম এবং সর্বদা চলমান, কারণ যা কিছু পরিবর্তিত হয়, তার মূলে আছে গতি; একে তিনি জীবিত প্রাণীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নিঃসীম এই বায়ু থেকেই উৎপত্তি সব উপাদানের, আর যা কিছু সৃষ্টি হবে তার সব কিছুর, আর সকল দেব-দেবীর; আর এদের থেকেই, পরবর্তীতে, উৎপন্ন হয় আর-সকল বস্তু। এ বায়ুর গঠন সম্পর্কে তিনি বলেন : সাধারণ অবস্থায় বায়ু অদৃশ্য; এটি দৃশ্যমান হয় তাপ, শৈত্য, আর্দ্রতা ও গতিশীলতার কারণে। বায়ু আরো হালকা হয়ে পরিণত হয় আগুনে; ঘনত্ব বাড়লে পরিণত হয় মেঘে, আর ঘনত্ব আরো বাড়লে জলে ও মাটিতে; আর, সবচেয়ে ঘন অবস্থায় বায়ু রূপ নেয় পাথরে। বস্তুর অবস্থার পেছনে দুটি বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য কাজ করে : তাপ ও শৈত্য। কেবল অবস্থার কারণেই যে বস্তু এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়—বৈজ্ঞানিক এ ধারণাটি অ্যানাক্সিমেনেসই সর্বপ্রথম পরিষ্কার করে বলেন।

পৃথিবী ও গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কেও মতামত দিয়েছেন তিনি। পৃথিবী, তাঁর মতে, থালার মতো চ্যাপ্টা এবং ভেসে আছে বাতাসের ওপর। চাঁদ, সূর্য ও অন্য সকল গ্রহ-নক্ষত্রই, যারা সবাই আগুনের তৈরি, একই রকম চ্যাপ্টা; একই রকম আকারের কারণেই এরা বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। পৃথিবী থেকেই আকাশে অবস্থিত সব কিছুর জন্ম। মাটির আর্দ্রতা থেকে জন্ম নেয় কুয়াশা; এ কুয়াশা আরো হালকা হয়ে পরিণত হয় আগুনে, আর এই আগুন থেকেই উৎপত্তি সকল গ্রহ-নক্ষত্রের। মাটি দ্বারা তৈরি কিছু বস্তুপিণ্ডও গ্রহ-তারার সাথে সাথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

চাঁদ-সূর্যসহ সব গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিবীর নিচে চলে যায় না, বরং তারা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যকে যে আমরা মাটির নিচে চলে যেতে দেখি—তার কারণ পৃথিবীর উপরিতলের অসমতা আর পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব। আগুনে তৈরি এইসব গ্রহ-নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে কোনো তাপ আসে না, কারণ এদের অবস্থান পৃথিবী থেকে অনেক দূরে।

পৃথিবীপৃষ্ঠের জলবায়ু সম্পর্কেও আলাদাভাবে ব্যাখ্যা দেন অ্যানাক্সিমেনেস। বায়ুর ঘনত্ব কিছুটা বৃদ্ধি পেলে এবং তা চলমান হলে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়; এর ঘনত্ব আরো বাড়লে তা পরিণত হয় মেঘে, আর বৃষ্টিতে। মেঘে জলের ঘনত্ব বেড়ে গেলে তা পরিণত হয় শিলায়, ফলে শিলাবৃষ্টি হয়; আবার এই শিলার ঘনত্ব কমে গেলে তা পরিণত হয় তুষারে। বায়ুর চাপে মেঘের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি হলে যে আগুনের ঝলকানি দেখা দেয়, তা-ই বিদ্যুৎ চমক। ঘন বায়ুর ওপর সূর্যের আলো পড়লে সৃষ্টি হয় রঙধনুর। আর, তাপ ও শৈত্যের কারণে পৃথিবীর উপরিতলের পরিবর্তনের ফলে ঘটে ভূমিকম্প।

দৃশ্যমান জগৎকে নানাভাবে, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির মাধ্যমে, বুঝতে চেয়েছেন অ্যানাক্সিমেনেস। যুক্তি-নিরীক্ষণের আলোকে দাঁড় করিয়েছেন নিজস্ব ব্যাখ্যা। পরবর্তী প্রজন্মের দার্শনিকদের ওপর তাঁর চিন্তার ভালো রকম প্রভাব পড়ে। এ প্রভাব সবচেয়ে গভীরভাবে পড়েছিল স্যামোস দ্বীপের দার্শনিক পিথাগরাসের ওপর।

## চতুর্থ অধ্যায়
# গণিতের আরাধনা

### পিথাগরাস

প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে পিথাগরাস[১] বরাবরই ছিলেন বিশেষ এক মর্যাদায় আসীন। দর্শনের সাথে গণিতের যুক্তিবাদী চিন্তাকে সংযুক্ত করার প্রাথমিক কৃতিত্ব তাঁর।

সক্রেটিসপূর্ব যে সকল দার্শনিকের কথা গ্রিসের প্রাচীন দর্শন ও সাহিত্যে পাওয়া যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বলা হয়েছে পিথাগরাসেরই কথা। তার পরও তাঁর জীবন ও চিন্তা অনেকটাই রহস্যে আচ্ছন্ন। নানা রকম প্রবাদ ও জনশ্রুতি গড়ে উঠেছিল তাঁকে নিয়ে। তিনি বা তাঁর সরাসরি শিষ্যেরা লিখিত আকারে কোনো রচনা রেখে যাননি। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে তাঁর মতাদর্শের দার্শনিকরা দুটি ধারায় ভাগ হয়ে যান। পরবর্তীতে পিথাগরীয়[২] ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এসে মেশে প্লেটোর দর্শনের অনেক ভাবনা, সেইসঙ্গে পরবর্তী আরো অনেক দার্শনিকের ভাবনাচিন্তা। এসব পাঁচমিশালি ধ্যানধারণা থেকে কোনটা পিথাগরাসের মূল দর্শন আর কোনটা পরবর্তী সংযোজন—বুঝতে পারা রীতিমতো দুরূহ হয়ে ওঠে।

পিথাগরাসের জীবন ও ব্যক্তিত্ব ধোঁয়াশাপূর্ণ হবার আরো একটি কারণ—তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও ধর্মপ্রবক্তা[৩]। তাঁর মতবাদের মধ্যে গণিতের সত্য-সৌন্দর্যের পাশাপাশি এসে মিশেছে মরমীয়া[৪] ধর্মচিন্তার ছায়াময় বিস্তার।

## স্যামোস থেকে ক্রোটোনে

পিথাগরাস আনুমানিক ৫৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্যামোস[৫] দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বীপটি এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলের কাছে, মিলেটাসের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ধারণা করা হয়, এ দ্বীপেরই এক সম্ভ্রান্ত বংশে পিথাগরাসের জন্ম; তাঁর পিতার নাম ছিল নেসারকুস[৬]।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সমৃদ্ধ এক রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে স্যামোস। দ্বীপটি বাণিজ্যে মিলেটাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে; এর বাণিজ্যের প্রসার স্পেনের টারটেসাস[৭] পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে মূল্যবান ধাতুর খনি ছিল। পিথাগরাসের সময়ে স্যামোসে ক্ষমতাসীন ছিলেন পলিক্রেটাস[৮] নামের স্বৈরশাসক; ৫৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেন, আর ক্ষমতায় আসীন ছিলেন ৫১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। তাঁর অধীনে স্যামোস এক পরাক্রমশালী নৌবহর গড়ে তোলে। ৫৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্য-সম্রাট এশিয়া মাইনরের রাজ্যগুলোকে পদানত করেন। পারস্য সাম্রাজ্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে পলিক্রেটাস মিশরের রাজা অ্যামাসিসের[৯] সঙ্গে হাত মেলান। কিন্তু, যখন পারস্যরাজ ক্যাম্বাইসেস[১০] মিশর আক্রমণ করেন, পলিক্রেটাস পক্ষ পরিবর্তন করে মিশর আক্রমণের জন্য নৌবহর পাঠান। পরবর্তীতে, এশিয়া মাইনরের সারডেসে[১১] পারস্যরাজের নিযুক্ত ক্ষত্রপের হাতে তিনি বন্দি ও ক্রুশবিদ্ধ হন।

পলিক্রেটাস শিল্প-সাহিত্যের সমঝদার ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় স্যামোসে অনেক দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য ও স্থাপত্য গড়ে ওঠে। অ্যানাক্রেয়ন[১২] ছিলেন তাঁর সভাকবি। কিন্তু, পলিক্রেটাসের শাসন পিথাগরাসের মনঃপূত হয়নি; তিরিশ বছর বয়সে পিথাগরাস স্যামোস ছেড়ে চলে যান। কিংবদন্তি আছে, তিনি মিশরে গিয়ে গণিত ও দর্শন শিক্ষা করেন। পরবর্তীতে, ইতালির দক্ষিণাঞ্চলের ক্রোটোন[১৩] রাজ্যে তিনি বসবাস করতে শুরু করেন।

এশিয়া মাইনরের গ্রিক রাজ্যগুলোর মতো, ইতালির দক্ষিণে অবস্থিত

গ্রিক উপনিবেশ রাজ্যগুলোও ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। এই রাজ্যগুলোকে ডাকা হতো 'বৃহত্তর গ্রিস' বা 'ম্যাগনা গ্রেসিয়া'[১৪] নামে। এদের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগর হিসেবে পরিচিতি ছিল সাইবারিস[১৫] ও ক্রোটোনের। মিলেটাস ও স্যামোসের মতো নগরগুলোর সাথে এরা বাণিজ্য করত—এশিয়া মাইনর থেকে পণ্য আমদানি করে তার কিছু অংশ ইউরোপের অভ্যন্তরের অন্যান্য রাজ্যে রপ্তানি করত। নিজেদের মধ্যেও এদের যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। পিথাগরাস ক্রোটোনে আসার ঠিক আগে-আগে লোক্রি[১৬]-র হাতে পরাজিত হয় ক্রোটোন। আবার, পিথাগরাসের আবির্ভাবের কিছুদিন পর, ৫১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, আরেক যুদ্ধে সাইবারিসকে ক্রোটোন পরাজিত করে; সে যুদ্ধে সাইবারিস রাজ্যটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

এই ক্রোটোন রাজ্যেই নিজস্ব মতাবলম্বী একটি দল গড়ে তোলেন পিথাগরাস। নিজস্ব এক ধর্মে বিশ্বাস করতেন এঁরা সবাই; সে ধর্ম সংগোপন এক মরমী বিশ্বাসে লালিত। আর, আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি—এই ধর্মবিশ্বাসীরা সকলেই ছিলেন গণিতবিদ।

## দার্শনিক ও ধর্মপ্রণেতা

পিথাগরাস এবং তাঁর অনুসারী দলটি ক্রোটোন শহরে ভালোই প্রভাব বিস্তার করেছিল। ধারণা করা যায়, কিছু সময়ের জন্য তারা ক্রোটোনের রাজনৈতিক ক্ষমতাও করায়ত্ত করে। কিন্তু, একসময়, ক্রোটোনবাসীরা এ সম্প্রদায়ের প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠে; পিথাগরাস তাঁর দলবলসহ সে শহর ত্যাগ করে দক্ষিণ ইতালিরই আরেক শহর মেটাপন্টিয়নে[১৭] আস্তানা গাড়েন। এ শহরেই মৃত্যুবরণ করেন পিথাগরাস। তাঁর মৃত্যুর পরপরই তাঁকে ঘিরে জন্ম নেয় অনেক রকম প্রবাদ আর অলৌকিক কাহিনী। সব মিলে, কিংবদন্তির এক চরিত্রে পরিণত হন তিনি।

পিথাগরাসের প্রবর্তিত ধর্মের মতাবলম্বীরা আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন; সেইসঙ্গে, ধর্মাচারের অঙ্গ হিসেবে নানা রকম বিধি-নিষেধ

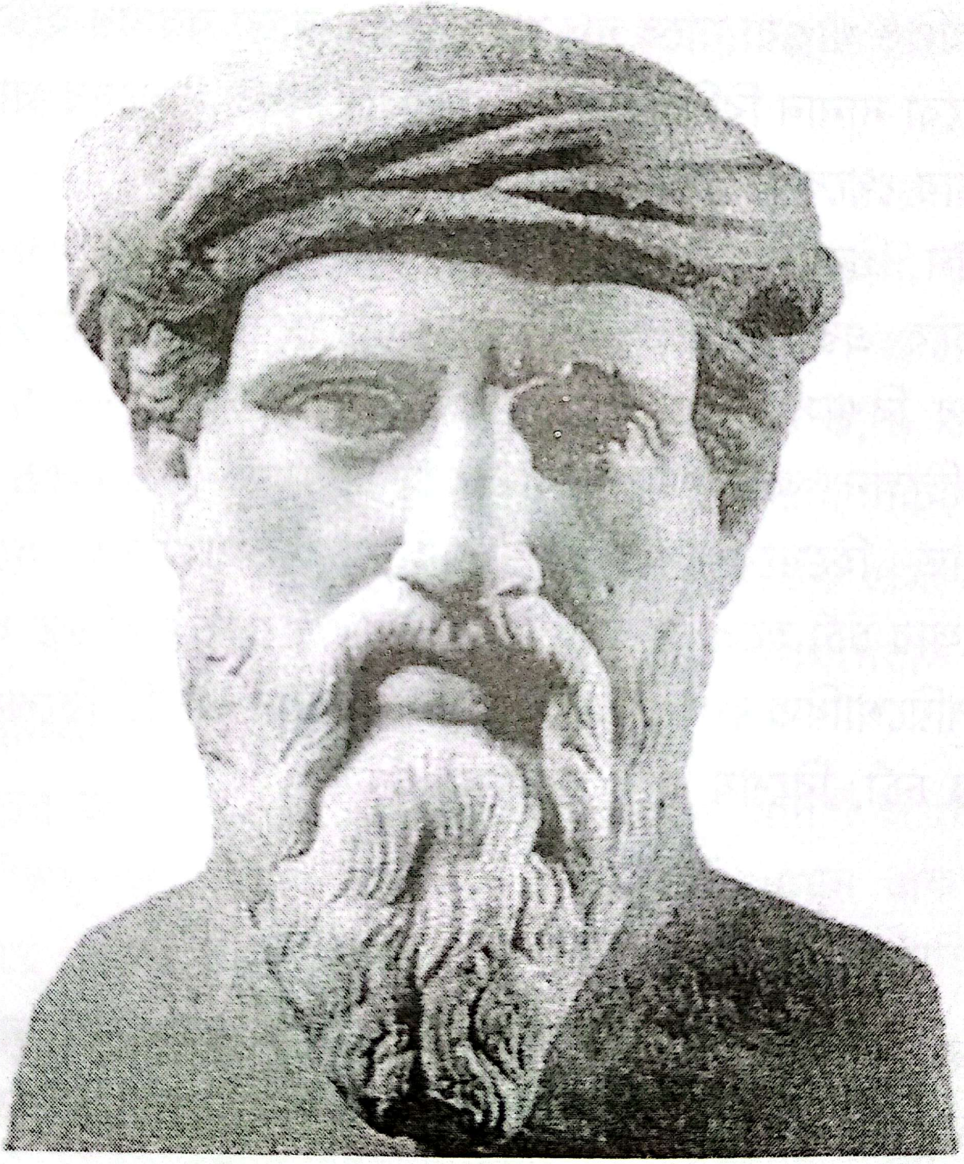

পিথাগরাস (আনু. খ্রি.পূ. ৫৭০)

মেনে চলতেন তাঁরা। এই সকল বিধি নিষেধের কয়েকটি এ রকম : শিম বা শিমের বিচি খাওয়া চলবে না; মাটিতে পড়ে যাওয়া কোনো জিনিস নিচু হয়ে তোলা যাবে না; সাদা রঙের কোনো মোরগকে স্পর্শ করা যাবে না; রুটি ছেঁড়া যাবে না, আস্ত রুটিও খাওয়া যাবে না; লোহার কিছু দিয়ে আগুন নাড়া যাবে না; ফুলের মালা থেকে ফুল ছেঁড়া যাবে না; কোনো প্রাণীর হৃৎপিণ্ড খাওয়া যাবে না; শহরের বড় রাস্তা বরাবর হাঁটা যাবে না। এমনি আরো নানান বিধি-নিষেধ। এগুলোর সবই মানুষের প্রাচীন বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে উদ্ভূত বাছবিচার।

প্রাচীন গ্রিকদের মূল ধর্মবিশ্বাস ছিল অলিম্পিক দেব-দেবীদের ঘিরে। তবে এর বিপরীত এক স্রোত হিসেবে জেগে উঠেছিল আরো প্রাচীন সব বিশ্বাস থেকে জন্ম নেওয়া অরফিক[১৮] ধর্ম—যে ধর্মের মূল আরাধ্য ছিলেন অরফিউস[১৯] বা ডায়োনিসাস[২০]। প্রচলিত ধর্মাচারের বিরুদ্ধস্রোত হিসেবে গড়ে উঠেছিল বলে অরফিক ধর্মের মরমী বিশ্বাসগুলোর চর্চা হতো সংগোপনে। পিথাগরাসের প্রবর্তিত ধর্ম অরফিক ধর্মেরই পরিশোধিত রূপ। তবে, তাঁর ধর্মমতের একটি বিশেষ দিক ছিল মেধাবৃত্তির চর্চা, বিশেষ করে গণিতের চর্চা।

## সকল বস্তুই সংখ্যা

'সকল বস্তুই সংখ্যা', বলেছিলেন পিথাগরাস। আজকের দিনের মানুষের কাছে এর আপাত অর্থের দ্যোতনা যেমনই হোক-না কেন, পিথাগরাসের এ কথার আড়ালে রয়েছে তাঁরই নিজস্ব কিছু ধারণা ও বিশ্বাস। সংগীতে সংখ্যার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন পিথাগরাস; সংগীত ও গণিতের মধ্যে তিনি যে যোগসূত্র স্থাপন করেন, আজও তার স্মারক হয়ে আছে 'ঐকতানিক গড়'[২১] এবং 'ঐকতানিক অগ্রসরতা'[২২]-র মতো পদগুলো। সংখ্যাকে নানা রকম আকার হিসেবে দেখতেন তিনি; আমরা আজও সংখ্যার বর্গ বা ঘনকের কথা বলি, যা সেই প্রাচীন স্মৃতিকেই বহন করে চলেছে। গোলাকার সংখ্যা, ত্রিভুজাকৃতি সংখ্যা, পিরামিডাকৃতি

সংখ্যা—এমনি-সব সংখ্যার কথা বলতেন পিথাগরাস। এসব আকার গড়ে ওঠে, এ রকমেরই সব সংখ্যার দ্বারা—এমনটাই বিশ্বাস করতেন তিনি। তাঁর ধারণার মূলে ছিল একরকম আণবিকবাদ[২৩]: বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন সংখ্যার কণা দ্বারা গঠিত বলেই বিভিন্ন আকার পায়—এ রকম এক বিশ্বাস। আর, এভাবে, গণিতকে নন্দনতত্ত্বের পাশাপাশি পদার্থবিদ্যার চালিকাশক্তি হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি।

পিথাগরাস সবচেয়ে বিখ্যাত তাঁর—কিংবা তাঁর কোনো শিষ্যের—রচিত জ্যামিতিক উপপাদ্যের[২৪] জন্য : 'সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গ এর অপর দুই বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান।' প্রাচীন মিশরীয়রা জানত যে, একটি ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য যদি ৩, ৪ ও ৫ হয়, তবে সে ত্রিভুজটি সমকোণী হবে। তবে, প্রাচীন গ্রিকরাই সম্ভবত প্রথম আবিষ্কার করে : $৩^২+৪^২=৫^২$। এই প্রস্তাবনার গাণিতিক প্রমাণও দাঁড় করায় তাঁরা। আর, এর পুরো কৃতিত্ব দেওয়া হয়—পিথাগরাস ও তাঁর অনুসারী দার্শনিক সম্প্রদায়টিকে।

দৃশ্যগোচর জগতের বাইরেও চিরকালীন এক আদর্শ জগৎ আছে, গণিতের সর্বাঙ্গসুন্দর রূপকে হৃদয়ঙ্গম করার পর, এমন এক বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে প্রাচীন গ্রিকমানসে। প্রাচীন গ্রিক দর্শনে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার পেছনেও আছে গণিত ও গাণিতিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা। আর, বাস্তবের ভঙ্গুরতার বিপরীতে গণিতের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেবার কৃতিত্ব পিথাগরাসের। তাঁর দর্শনের পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছে, প্রাচীন গ্রিসের পরবর্তী দার্শনিকগণ।

## পঞ্চম অধ্যায়

# দার্শনিক কবি

### কবিতায় দর্শন

প্রাচীন গ্রিসে কবিদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল, কবিরা সকলেই জ্ঞানী মানুষ। প্রাচীন গ্রিক কাব্যে অনেক সময়ই দর্শনের বিষয়গুলো উঠে আসত; কোনো কোনো কবিকে দার্শনিক হিসেবেই বিবেচনা করা হতো।

থ্যালেসের পূর্ববর্তী দর্শনচর্চার খোঁজ নিতে গেলে প্রাচীন গ্রিক কাব্যেরই মুখাপেক্ষী হতে হয়। গ্রিসের আদিকবি হোমার[১]। হোমারের মহাকাব্যদুটিতে, অনেক স্থানে, এমন সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, যেগুলো পরবর্তীকালে দর্শনচর্চার অংশ হয়ে ওঠে। প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের উৎপত্তি বিষয়ে *ইলিয়াড*[২] ও *অডিসি*[৩]-তে যেসব বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকদের ভাবনা-চিন্তা অনেকাংশে মিলে যায়।

বিশ্বজগতের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আরো বিশদ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের কবি হেসিওডের[৪] *থিওগনি*[৫] কাব্যে। এ কাব্যে যেসব দেব-দেবীর কথা বলা হয়েছে, তাঁরা সকলেই মূলত বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি; প্রকৃতির পরাক্রমশালী বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর দেবত্ব আরোপ করে এসব দেব-দেবীকে কল্পনা করা হয়েছে। এই দেব-দেবীদের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে হেসিওড বিশ্বজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন।

অ্যারিস্টটল তাঁর *মেটাফিজিক্স*[৬] গ্রন্থের শেষভাগে আরেকজন কবির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর নাম ফেরেসাইডেস[৭]। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার কবি তিনি; বসবাস করতেন সাইরস নগরে। সময়কাল বিবেচনা করলে, তিনি সক্রেটিসপূর্ব প্রথম দার্শনিকদের, বিশেষ করে থ্যালেসের, সমসাময়িক। তাঁর সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের অভিমত হচ্ছে, তিনি আংশিকভাবে পুরাণবেত্তা[৮], আর আংশিকভাবে 'প্রাকৃতিক দার্শনিক'।

পিথাগরাসের পরবর্তী প্রজন্মের একজন কবিকে দার্শনিক হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। সে কবির নাম জেনোফেনেস[৯]।

## পূর্বসূরিদের বিরুদ্ধে

জেনোফেনেসের জন্ম আয়োনিয়ার কলোফোনে[১০]। তিনি গ্রিসের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে মানুষকে কবিতা শোনাতেন; নিজের লেখা কবিতার পাশাপাশি অন্য কবিদের কবিতাও তিনি আবৃত্তি করতেন। কবিতার সনাতন বিষয়গুলো ছাড়াও ঐতিহাসিক নানা ঘটনা নিয়ে কবিতা রচনা করেন তিনি; আর, দর্শনের নানা বিষয়ও উঠে আসত তাঁর কবিতায়। প্রাচীন গ্রিসে তাঁকে একজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। বলা হয়, তিনি ছিলেন দার্শনিক পারমেনিডেসের শিক্ষক।

দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন জেনোফেনেস। তাঁর একটি কবিতার ভগ্নাংশে তিনি বলেছেন, পঁচিশ বছর বয়স থেকে তিনি মানুষকে কবিতা শুনিয়ে আসছেন, এবং এর পর আরো সাতষট্টি বছর কেটে গেছে। অর্থাৎ, এ কবিতা তিনি যখন রচনা করেন তখন তাঁর বয়স বিরানব্বই পেরিয়ে গেছে। ধারণা করা হয়, তিনি একশ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর জীবৎকাল, আনুমানিক, ৫৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

তাঁর পূর্বসূরি কবি ও দার্শনিকদের প্রতি খুব বেশি শ্রদ্ধা ছিল না জেনোফেনেসের। নিজের কবিতায়, বিভিন্ন সময়ে, পূর্বসূরি দার্শনিক-কবিদের নিয়ে তিনি নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। হোমার ও হেসিওডের

কাব্যে দেব-দেবীদের চরিত্র যেভাবে আঁকা হয়েছে, তার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি; তাঁর মতে, এ কাব্যগুলোয় এসব দেব-দেবীরা যেভাবে আচরণ করেন, তা রীতিমতো অনৈতিক ও অগ্রহণযোগ্য।

পিথাগরাস-প্রবর্তিত ধর্মের একটি মূল দিক ছিল আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস নিয়েও জেনোফেনেস শ্লেষ করতে ছাড়েননি। তাঁর এক কবিতায় পিথাগরাস সম্পর্কে তিনি এই গল্পটি বলেছেন : একদিন পিথাগরাস পথ চলতে চলতে দেখলেন, একটি কুকুরছানাকে পেটানো হচ্ছে; কুকুরছানাটার প্রতি তাঁর দয়া হলো, তিনি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'থামো, ওকে মেরো না! ও আমার এক মৃত বন্ধুর আত্মা, ওর গলার স্বর শুনেই আমি ওকে চিনতে পেরেছি!'[১১]

## সংশয়বাদ, একেশ্বরবাদ, বস্তুজগৎ

জেনোফেনেস ছিলেন সংশয়বাদী[১২] দার্শনিক। সেইসঙ্গে তিনি যুক্তিবাদীও[১৩] ছিলেন। গ্রিসের প্রচলিত ধর্মের দেব-দেবীদের ওপর কোনো রকম বিশ্বাস ছিল না তাঁর। তিনি তাঁর কবিতায় বলেছেন, মানুষ যত চেষ্টাই করুক, দেবতাদের সম্পর্কে সঠিক কোনো জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না—তার পরও মানুষ এসব দেবী-দেবীর ওপর বিশ্বাসে অটল! মানুষেরা মনে করে, মানুষের মতো দেবতাদেরও জন্ম হয়, আর তাঁরা মানুষেরই মতো পোশাক-আশাক পরে, মানুষের মতোই কথা বলে। পুরো ব্যাপারটা জেনোফেনেসের কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে। তিনি বলেন : গরু বা ঘোড়া বা সিংহের যদি হাত থাকত, আর সে হাত দিয়ে তারা যদি মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে সেইসব আঁকতে পারত, তাহলে ঘোড়ারা তাদের দেবতাদের আঁকত ঘোড়ার রূপ দিয়ে আর গরুরা তাদের দেবতাদের দিত গরু-সদৃশ রূপ! ইথিওপীয়রা তাদের দেবতাকে রূপ দিয়েছে কালো চামড়ায় আর বোঁচা নাকে; থ্রেসীয়রা তাদের দেব-দেবীকে কল্পনা করেছে তাদেরই মতো লাল চুল আর নীল চোখের চেহারায়!

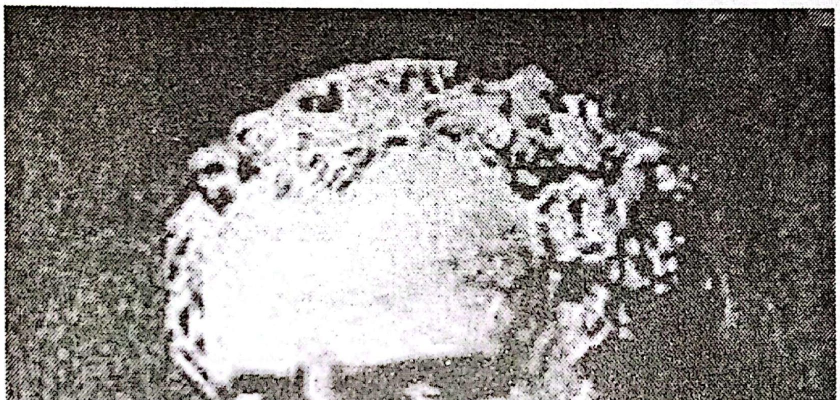

জেনোফেনেস (খ্রি.পূ. ৫৮০–৪৮০)

বহু দেব-দেবীর বদলে জেনোফেনেস বিশ্বাস করতেন এক ঈশ্বরে—এক দিব্য[১৪] অস্তিত্বে। তিনি বলেন, এমন দৈব অস্তিত্ব যদি সত্যিই থাকে তবে তা সর্বব্যাপী এক সত্তা। সব কিছুর উদ্ভবের মূলে আছে এই সত্তা : এ সত্তা একইসাথে একক ও বহু; এর সীমা নেই, আবার তা অসীমও নয়; এর গতি নেই, আবার তা স্থিরও নয়। এই এক আর বহুই হলেন ঈশ্বর!

বস্তুজগতের উদ্ভব সম্পর্কে জেনোফেনেসের ধারণা—দুটি মূল উপাদান থেকে বস্তুজগৎ সৃষ্ট। এ দুটি উপাদান হলো : জল ও মাটি। সব কিছুই মাটি থেকে উৎপন্ন হয়, আবার মাটিতে গিয়েই মেশে; আবার, সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয় বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টি, মাটির ওপর প্রবাহিত সব নদ-নদী। জল ও মাটির পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই বস্তুজগতের সব কিছুর উৎপত্তি। প্রকৃতির নানা দিক সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন জেনোফেনেস। সমুদ্রের জল কেন লবণাক্ত হয় সে সম্পর্কে নিজস্ব মতামত জানিয়েছেন তিনি; আবার, রঙধনু সম্পর্কে বলেছেন, রঙধনু আসলে একরকম মেঘ, যাকে আমরা বেগুনি, লাল, সবুজ এমনই নানা রঙে দেখি। পাহাড়ের কোনো কোনো গুহা থেকে জল চুইয়ে পড়ে, আবার অনেক পাহাড়ি এলাকায় মাছের ও জলজ প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়—এমনি সব উপাত্ত থেকে, জল ও মাটিকে মূল উপাদান ধরে, স্বয়ংক্রিয় এক সৃষ্টিতত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি।

পিথাগরাস-পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে জেনোফেনেসের রচনাতেই প্রথম পিথাগরাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার হেরাক্লিটাস[১৫] তাঁর রচনায় জেনোফেনেসের কথা বলেছেন। ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক দর্শনের বিপরীতে সংশয়বাদী ও যুক্তিবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠায় জেনোফেনেসের নিজস্ব একটি ভূমিকা ছিল। সেইসঙ্গে, সক্রেটিসপূর্ব গ্রিক দর্শনের উল্লেখযোগ্য দুই দার্শনিক পিথাগরাস ও হেরাক্লিটাসের মধ্যেকার প্রয়োজনীয় যোগসূত্রটির দেখা মেলে জেনোফেনেসের রচনায়।

## ষষ্ঠ অধ্যায়
# বস্তুজগতের পরিবর্তনশীলতা

### হেরাক্লিটাস

আয়োনিয়ার ইফিসাস[১] নগরের অধিবাসী ছিলেন হেরাক্লিটাস; আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, এই নগরেই বসবাস করতেন তিনি। আয়োনিয়ার অধিবাসী হলেও আয়োনীয় অন্য দার্শনিকদের মতো তিনি বস্তুবাদী ছিলেন না। পিথাগরাসের মতোই মরমীয়া এক ধর্মবিশ্বাসে আস্থা ছিল তাঁর। তবে সে ধর্মমত ছিল পিথাগরীয় ধর্মবিশ্বাস থেকে আলাদা। পিথাগরাস সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ আছে হেরাক্লিটাসের রচনায়; যেমন বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য আছে অন্য আরো অনেক দার্শনিক ও কবি সম্পর্কে।

জেনোফেনেস যেমন বিরূপ সমালোচনা করেছেন তাঁর পূর্বসূরিদের, হেরাক্লিটাসও তেমনি তাঁর আগের প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য কবি ও দার্শনিকদের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। তাঁর সমালোচনার ভাষা আরো কঠিন, আরো বিদ্বেষপূর্ণ। এই বিদ্বেষ ও শ্লেষের হাত থেকে রেহাই পাননি জেনোফেনেস নিজেও। পূর্বসূরিদের সম্পর্কে হেরাক্লিটাসের একটি মন্তব্য এ রকম : 'অনেক জানলেই চিন্তা করতে শেখা যায় না—যদি যেত, তবে হেসিওড ও পিথাগরাস, এবং জেনোফেনেস ও হেকাটিয়াস[২] চিন্তা করতে শিখত।'[৩] হোমার সম্পর্কে তাঁর মত : 'হোমারকে [জ্ঞানী মানুষদের] তালিকা থেকে বের করে দেওয়া উচিত, আর চাবকানো উচিত।'[৪]

বদমেজাজি আর রুক্ষ স্বভাব ছিল হেরাক্লিটাসের। তাঁর রচনার

ভাষায় যেমন এর প্রমাণ মেলে, তেমনি প্রাচীন গ্রিক লেখকদের কারো কারো রচনায়ও তার আভাস পাওয়া যায়। তাঁর লেখার ভাষাও জটিল, আর হেঁয়ালিতে ভরা। সেসব রচনার যে ভগ্নাংশগুলো আজও টিকে আছে, তার মর্মোদ্ধার করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়েছে পণ্ডিতদের; পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে জন্ম নিয়েছে অনেক তর্ক-বিতর্কও। বাস্তবজীবনেও এ রকম হেঁয়ালিভরেই কথা বলতেন হেরাক্লিটাস, সে কথাও কোনো কোনো প্রাচীন গ্রিক লেখক উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচনার হেয়ালি ও দুরূহতার জন্য প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যে তাঁকে 'ধাঁধা-সৃষ্টিকারী'[৫] ও 'দুরূহ'[৬]—এই দুই অভিধা দেওয়া হয়েছিল।

ইফিসাসের সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মেছিলেন হেরাক্লিটাস। কিন্তু ইফিসাসবাসীর প্রতিও তাঁর বিদ্বেষ কম ছিল না; এক জায়গায় বলেছেন, "ইফিসীয়দের সবারই মৃত্যুবরণ করা উচিত, প্রত্যেকেরই ফাঁসি হওয়া উচিত! কারণ তারা তাদের মধ্যে সেরা মানুষ হেরমোডরাসকে তাড়িয়েছে এই বলে, 'আমাদের মধ্যে কারো সেরা হবার দরকার নেই। এরকম সেরা মানুষ যদি কেউ থাকে, তবে সে অন্য কোনোখানে, অন্য মানুষদের সঙ্গে গিয়ে থাকুক!'"[৭] সাধারণ মানুষের প্রতিই সবরকম শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলেন হেরাক্লিটাস; বলেছেন, 'স্বর্ণের চেয়ে খড়ই গাধাদের বেশি পছন্দ!'[৮] কথিত আছে, শেষ বয়সে রীতিমতো মানববিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন তিনি, আর লোকালয় ত্যাগ করে পাহাড়ে-জঙ্গলে গিয়ে নির্জনবাস করতে শুরু করেন।

## অনির্বাণ বহ্নি

হেরাক্লিটাস মনে করতেন, বস্তুজগতের উৎস হলো : আগুন। এ আগুন অনির্বাণ, চির জাগরুক। তাঁর রচনার এক অংশে, বস্তুজগৎ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এ জগৎ সবার জন্য সমান, কোনো মানুষ বা দেবতা এর সৃষ্টি করেনি। এ সব সময় ছিল, সব সময় থাকবে—চিরবহ্নিমান অগ্নি—নির্দিষ্ট পরিমাণে জ্বলছে, নির্দিষ্ট পরিমাণে নিভছে।'[৯] আরো বলেছেন, 'সব বস্তুই আগুনের বিনিময়ে, আবার সব বস্তুর বিনিময়েই

হেরাক্লিটাস (খ্রি.পূ. ৫৩৫–৪৭৫)

আগুন—যেমন পণ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ, আবার স্বর্ণের বিনিময়ে পণ্য।'[১০]

হেরাক্লিটাস বলেন, আগুন থেকে উৎপন্ন হয় সাগর, আর সাগর থেকে মাটি। 'সাগর সমান অনুপাতে দ্রবীভূত হয়, আর পরিণত হয় মাটিতে।'[১১] আরেক জায়গায় বলেছেন : 'বায়ুর মৃত্যু থেকে জীবন পায় আগুন, আগুনের মৃত্যু থেকে জীবন পায় বায়ু। মাটির মৃত্যু থেকে জীবন পায় জল, জলের মৃত্যু থেকে জীবন পায় মাটি।'[১২]

আগুন ও জলের সমন্বয়ে গঠিত হয় আত্মা—এমন এক বিশ্বাস ছিল হেরাক্লিটাসের। এ দুইয়ের মধ্যে আগুন ভালো আর জল মন্দ। যে আত্মায় আগুনের পরিমাণ বেশি তাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'শুকনো' হিসেবে, আর বলেছেন, 'শুকনো আত্মাই সবচেয়ে জ্ঞানী, সবার সেরা।'[১৩] সব আত্মারই ঝোঁক আর্দ্রতা বা জলের দিকে, এমন মন্তব্যও করেছেন তিনি; বলেছেন, 'কোনো লোক যখন মাতাল হয়, তখন সে অল্পবয়সী এক ছেলের হাত ধরে চলে, তার পা টলমল করে। সে জানে না কোথায় সে চলেছে; তার আত্মা আর্দ্র হয়ে ওঠে।'[১৪] আরো বলেছেন : 'আত্মা যখন জলে পরিণত হয়, তখন তার পরিণতি মৃত্যু।'[১৫]

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে একরকম মরমী ধর্মবিশ্বাসের মিশেল ঘটেছে হেরাক্লিটাসের চিন্তায়, রচনায়। তাঁর সময়ের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি। লোকায়ত অর্ফিক ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গেও তাঁর ধর্মচিন্তা পুরোপুরি মেলে না। প্রচলিত ও লোকায়ত বিশ্বাসগুলোকে ঢেলে সাজিয়ে নিজের মতবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছেন হেরাক্লিটাস। ধর্মবিশ্বাস হিসেবে সে মতবাদের কোনো মূল্য নেই আজ; কিন্তু, তার আড়ালের দর্শনচিন্তা এখনো আপন ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর।

## বিশ্বজাগতিক সংঘর্ষ, বিশ্বজাগতিক ন্যায়

হেরাক্লিটাস বিশ্বাস করতেন, বিশ্বজগতের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারস্পরিক সংঘর্ষ। 'মানুষের বোঝা উচিত—যুদ্ধ সর্বব্যাপী এবং সংঘর্ষই ন্যায়, এবং সমস্ত কিছুর জন্ম হয় সংঘর্ষের মাধ্যমে, যা ঘটবে

তারই মাধ্যমে।'[১৬] আর, বিপরীতের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় ভারসাম্য : 'মানুষ জানে না, যা বিপরীতধর্মী তা থেকেই স্বধর্মের সৃষ্টি হয়; পরস্পর বিপরীতমুখী দুই শক্তির টানাপোড়েনেই এই সামঞ্জস্য তৈরি হয়, যেমন টানটান হয়ে থাকে ধনুকের ছিলা কিংবা বীণার তার।'[১৭]

বিশ্বজাগতিক সংঘর্ষের ভেতর দিয়েই তৈরি হয় বিশ্বজাগতিক ভারসাম্য। জগৎব্যাপী যে ভারসাম্য বিরাজ করে তার নাম দিয়েছেন হেরাক্লিটাস 'এক'[১৮]; এ ভারসাম্যের ব্যাপ্তির পেছনে আছে জগৎব্যাপী সংঘর্ষের টানাপোড়েন। এ বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তিনি এভাবে : 'যা কিছু যুগ্ম—তারা সম্পূর্ণ, আবার একই সাথে অসম্পূর্ণ; পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত, আবার বিকর্ষিত; ভারসাম্যপূর্ণ, আবার ভারসাম্যহীন। সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এক, আবার একের থেকেই সৃষ্টি সমস্ত কিছুর।'[১৯]

কখনো কখনো, হেরাক্লিটাসের কথায় মনে হয়, বৈপরীত্যের চাইতে ভারসাম্যের গুরুত্বই যেন বেশি। যেমন, তিনি বলেছেন : 'ভালো ও মন্দ মিলেই এক।'[২০] আবার : 'ঈশ্বরের কাছে সবকিছুই সুন্দর, ভালো ও সঠিক, কিন্তু মানুষই কিছু জিনিসকে ঠিক আর কিছু জিনিসকে মন্দ বলে।'[২১] আবার বলেছেন : 'ওপরে ওঠা এবং নিচে নামা এক ও অভিন্ন।'[২২] বলেছেন : 'ঈশ্বর হলেন দিন ও রাত্রি, শীত ও গ্রীষ্ম, যুদ্ধ ও শান্তি, উদ্বৃত্ত ও অভাব; কিন্তু তিনি নানা আকার ধারণ করেন, যেমন আগুনের মধ্যে মশলা ছিটালে আগুনকে সে মশলার গন্ধ অনুসারে নাম দেওয়া হয়।'[২৩] আবার, বিপরীতের সংঘর্ষ না হলে ভারসাম্য তৈরি হয় না, এ ব্যাপারেও তিনি সচেতন : 'বিপরীত যা কিছু, তাতেই আমাদের মঙ্গল।'[২৪]

বিশ্বজাগতিক এ সংঘর্ষে বিপরীত দুই শক্তির একটি অপরকে ছাড়িয়ে যায় না। জগৎব্যাপী এই ভারসাম্যের আড়ালে রয়েছে 'বিশ্বজাগতিক ন্যায়'[২৫]। অ্যানাক্সিম্যান্ডারের মতো, বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত এক ন্যায়ের কথা বলছেন হেরাক্লিটাসও। ন্যায়ের এমন প্রতিষ্ঠার

কারণেই কোনো শক্তি তার বেঁধে দেওয়া সীমা অতিক্রম করতে পারে না; সব কিছুই নির্দিষ্ট এক নীতির দণ্ডের অধীন। 'সকাল ও রাতের সীমা টানা আছে... সূর্য সে-সীমা অতিক্রম করে না।'[২৬] আবার : 'সূর্য তার নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে যায় না; যদি যায়, তবে ন্যায়ের দণ্ডধারীরা তাকে ছাড় দেবে না।'[২৭]

দৈবশক্তির উল্লেখ করতে গিয়ে হেরাক্লিটাস কখনো বহু দেব-দেবীর কথা বলেননি; বলেছেন একক ঈশ্বরের কথা। 'মানুষের পথ প্রজ্ঞার পথ নয়; ঈশ্বরের পথই প্রজ্ঞার পথ।'[২৮] আবার বলেছেন : 'ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করলে, সবচেয়ে প্রাজ্ঞ মানুষটিও বানরের মতো কদাকার; আবার, সবচেয়ে সুন্দর বানরও মানুষের তুলনায় কদাকার।'[২৯] বিশ্বজাগতিক ন্যায়ের যে ধারণা হেরাক্লিটাসের রচনায় রয়েছে, 'এক'-এর ধারণা এবং ঈশ্বরের ধারণা তারই আরেক রূপ।

## নিরন্তর বহমানতা

প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি, দার্শনিক হিসেবে হেরাক্লিটাসের খ্যাতির পেছনে আছে—বস্তুজগৎ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ এক ধারণা। বলা হয়, তিনি বলেছিলেন, 'সব কিছুই প্রবাহিত হচ্ছে।' তবে এ কথা তাঁর নিজের বলা কি না, সে বিষয়ে সংশয় আছে। তবে বস্তুজগতের পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে তিনি যে অনেকবার বলেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো। পরবর্তীতে, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রচনায়, নানা জায়গায়, হেরাক্লিটাসের এ ধারণার উল্লেখ আছে। প্লেটো বলেছেন, হেরাক্লিটাসই শিখিয়েছিলেন, 'কোনো কিছুই এক অবস্থায় নেই; সব কিছুই হয়ে উঠছে।'[৩০] আর, অ্যারিস্টটল হেরাক্লিটাসের ধারণা সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন, 'কোনো কিছুর অবস্থাই পুরোপুরি স্থির নয়।'[৩১]

আগুন থেকে সমস্ত কিছুর উৎপত্তি; আবার সব কিছু আগুনেই মিলিয়ে যায়। এমন ধারণা থেকেই বস্তুজগতের অনিত্যতা এবং ক্রমপরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর মতবাদটি দাঁড় করিয়েছিলেন হেরাক্লিটাস।

বিপরীতমুখী শক্তির ক্রমাগত টানাপোড়েনে ও সংঘর্ষে সব কিছুর জন্ম হচ্ছে, আবার তা মিলিয়েও যাচ্ছে; আবার নতুনভাবে জন্ম নিচ্ছে। এ প্রক্রিয়া ধারাবাহিক, চিরকালীন। সময়ের স্রোতের সাথে একে তুলনা করা যায়। স্বভাবসুলভ হেঁয়ালির সুরে হেরাক্লিটাস বলেছেন : 'একই নদীতে আমরা পা ফেলি এবং ফেলি না; আমরা আছি এবং আমরা নেই।'[৩২]

নদী প্রতিনিয়ত বয়ে চলে, প্রতিমুহূর্তে নতুন রূপ নেয়—বস্তুজগৎও তেমনি নিয়ত পরিবর্তনশীল। 'প্রতিদিন নতুন সূর্য ওঠে,'[৩৩] বলেছেন হেরাক্লিটাস।

মানুষ সব কিছুতেই স্থিতি চায়। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরাও তেমনি বস্তুজগতের এক নিত্য রূপ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে আসছেন, সেই প্রাচীন কাল থেকেই। প্রাচীন গ্রিক দর্শনে যে দার্শনিকের চিন্তায় এই চেষ্টা সর্বপ্রথম স্পষ্ট রূপ পায়, তাঁর নাম পারমেনিডেস[৩৪]।

সপ্তম অধ্যায়

# বস্তুজগতের স্থিতি

## পারমেনিডেস

গ্রিকমানসের একটা চরমভাবাপন্ন দিক ছিল। হেরাক্লিটাস বললেন, বস্তুজগতের সব কিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। অনেকটা এর জবাবেই যেন, পারমেনিডেস জানালেন, বস্তুজগতের কিছুরই পরিবর্তন হয় না।

পারমেনিডেসের জন্ম হয়েছিল দক্ষিণ ইতালির গ্রিক উপনিবেশ-শহর ইলিয়ায়[১]। প্লেটোর এক রচনায় পারমেনিডেস সম্পর্কে যে তথ্য দেওয়া আছে, তা থেকে ধারণা করা হয়, তাঁর জন্ম হয়েছিল ৫১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু বেশির ভাগ প্রাচীন গ্রিক রচয়িতার হিসাব মতে তাঁর জন্মসাল ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ; তাঁর পিতার নাম পাইরেস[২]। প্লেটোর রচনাটিতে আছে, সক্রেটিসের তরুণ বয়সে তাঁর সঙ্গে পারমেনিডেসের একবার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। পারমেনিডেসের তখন অনেক বয়স হয়ে গেছে। সক্রেটিস ওই বৃদ্ধ দার্শনিকের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন, এমনটাই লিখেছেন প্লেটো। তবে এর ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করে দেখার উপায় নেই।

বলা হয়, পারমেনিডেসের শিক্ষক ছিলেন জেনোফেনেস। তবে তিনি গুরুর মত অনুসরণ করেননি। আবার, অ্যামেইনিয়াস[৩] নামের আরেক পিথাগরীয় দার্শনিকেরও ছাত্র ছিলেন পারমেনিডেস, এমনও বলা হয়। অ্যামেইনিয়াস দরিদ্র জীবনযাপন করতেন; কথিত আছে, তাঁর মৃত্যুর পর পারমেনিডেস তাঁর কবরটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। দক্ষিণ

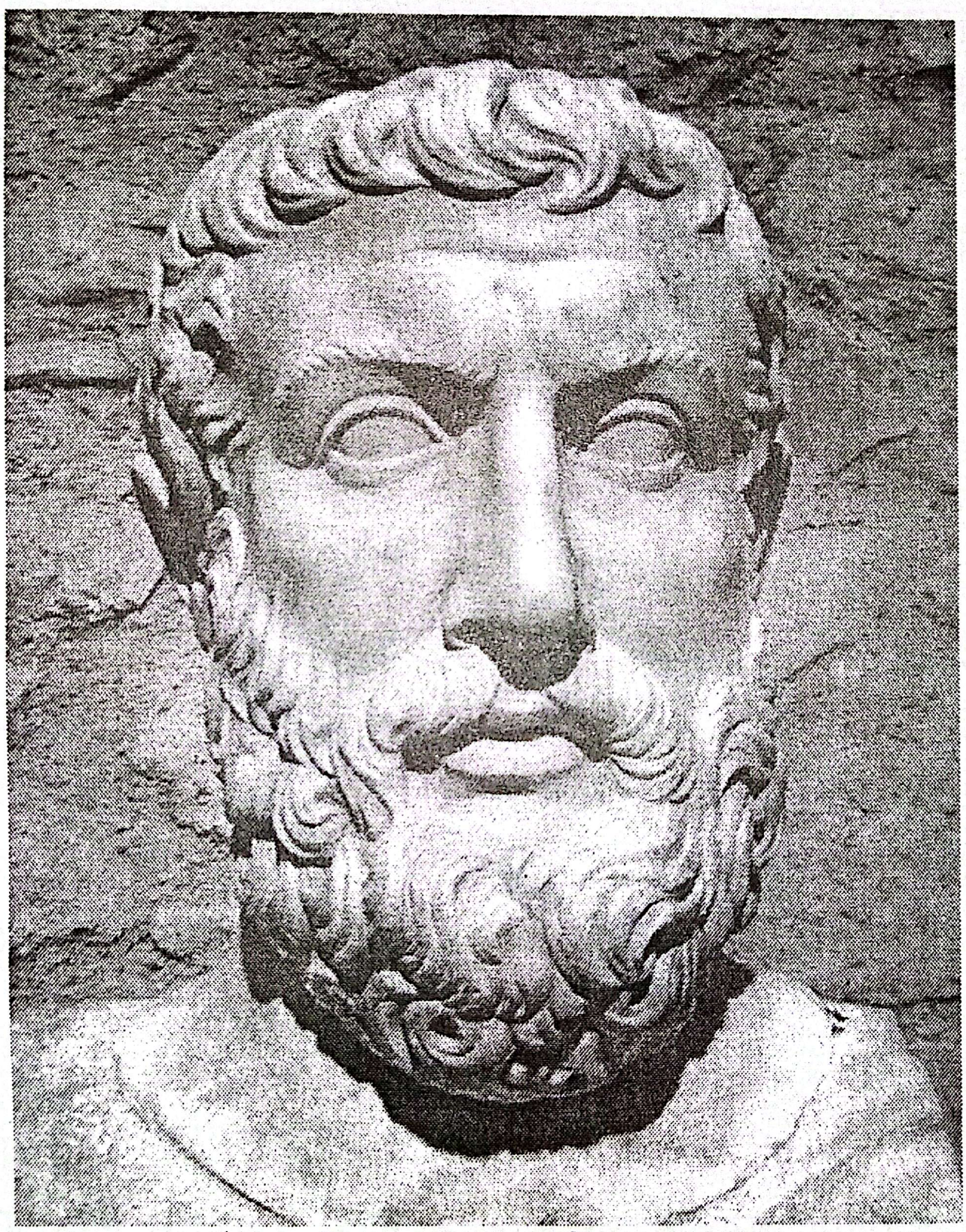

পারমেনিডেস (আনু. খ্রি.পূ. ৫১৫)

ইতালি ও সিসিলির দার্শনিকদের মতবাদে দর্শনের সঙ্গে মরমী ধর্মবিশ্বাসের একরকম মিশেল ঘটেছিল। পিথাগরাসসহ এ অঞ্চলের অন্য আরো অনেক দার্শনিকের বেলায়ই এ কথা খাটে। কিন্তু পারমেনিডেসের দর্শনে কোনো মরমী বিশ্বাসের দেখা মেলে না।

পারমেনিডেসের খ্যাতির পেছনে প্লেটোর রচনার ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি; পারমেনিডেসের দর্শনকে তিনিই চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। পারমেনিডেসের দর্শনেই আমরা প্রথমবারের মতো অধিবিদ্যা[৪]-র আস্বাদ পাই; সেইসঙ্গে দেখা মেলে যুক্তিবিদ্যার[৫]-ও।

## যুক্তি ও অধিবিদ্যা

পারমেনিডেসের একটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়; এটি একটি কাব্য, যার শিরোনাম *প্রকৃতি সম্পর্কে*। এর দুটি অংশ : 'সত্যের পথ'[৬] এবং 'মতামতের পথ'[৭]। প্রথম অংশটি প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থায়ই আছে; আর দ্বিতীয় অংশের কিছু ভাঙা অংশ পাওয়া গেছে। অবশ্য, পারমেনিডেসের দর্শন ও অধিবিদ্যার প্রায় সবটা রয়েছে এই 'সত্যের পথ' অংশেই।

পারমেনিডেসের মতে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যে বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা লাভ করি, তা ভ্রমাত্মক। তা মায়া মাত্র। সবচেয়ে সত্য 'এক'[৮]; এই 'এক' অসীম ও অবিভাজ্য। হেরাক্লিটাসের 'এক'-এর মতো পারমেনিডেসের 'এক' দুই বিপরীতের সংঘর্ষে উৎপন্ন হয় না। পারমেনিডেসের মতে, জগতে কোনো বৈপরীত্যই নেই। যা অন্ধকার, তা আসলে আলোর অনুপস্থিতি; যেখানে শীত, সেখানে উষ্ণতার অভাব। এই 'এক'কে পারমেনিডেস ঈশ্বর হিসেবে দেখেননি। একে তিনি এক গোলাকার অস্তিত্ব হিসেবে কল্পনা করেছেন, যা বস্তুজাগতিক ও সর্বব্যাপী এবং যা অবিভাজ্য। এই 'এক' সবখানে, সব সময় আছে।

পারমেনিডেসের রচনার 'সত্যের পথ' অংশে যেখানে তিনি অধিবিদ্যাগত বিতর্কের অবতারণা করছেন, তা এ রকম :

'যা নেই, সে সম্পর্কে তুমি জানতে পারো না, বলতেও পারো

না—তা অসম্ভব। যা চিন্তা করা যায়, সে সম্পর্কেই কথা বলা যায়।

'কীভাবে, তাহলে, যা *আছে* তা ভবিষ্যতেও হবে? অথবা কীভাবে তা হয়ে উঠবে? যদি তা হয়ে *ওঠে*, তবে তা ছিল না; ভবিষ্যতে হলে, বর্তমানে তা নেই। এভাবে *হয়ে ওঠা*-র কোনো অস্তিত্ব থাকে না, *শেষ হয়ে যাওয়া* সম্পর্কেও কোনো কথা চলে না।

'যে বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা যায় এবং যার জন্য চিন্তার জন্ম হয়—এ দুই একই জিনিস। কারণ, যা আছে এমন কিছু ছাড়া তুমি চিন্তা করতে পারো না, আর সেটা সম্পর্কেই তুমি কথা বলো।'[৯]

ওপরের তর্কের সারমর্ম মোটামুটি এ রকম : যখন আমরা চিন্তা করি, আমরা কোনো 'কিছু' সম্পর্কেই চিন্তা করি। আমরা যখন কোনো নাম দিই, আমরা কোনো 'কিছু'কেই নাম দিই। চিন্তা এবং ভাষা, ব্যবহারের কার্যকারিতার জন্যই, বাইরের এক বস্তুজগৎকে আশ্রয় করে সংঘটিত হয়। আর, যেহেতু আমরা কোনো কিছু নিয়ে যেকোনো সময় ভাবতে বা বলতে পারি, আবার সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী যেকোনো সময়ও ভাবতে বা বলতে পারি—তাহলে যা কিছু নিয়েই চিন্তা করা যায় বা কথা বলা যায়, তার সব কিছুরই অস্তিত্ব সব সময় থাকে। কাজেই কোনো কিছুরই কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়, কারণ পরিবর্তন মানেই কোনো কিছুর 'হয়ে ওঠা' বা 'শেষ হয়ে যাওয়া'। কাজেই বস্তুজগৎ অপরিবর্তনশীল।[১০]

দর্শনের ইতিহাসে এ-ই প্রথম দৃষ্টান্ত—যেখানে যুক্তি-প্রয়োগের মাধ্যমে, চিন্তা ও ভাষার মাধ্যমে, বস্তুজগৎ সম্পর্কে একটা ধারণায় উপনীত হবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

## ইলিয়াটিক ঘরানা

যেমন মিলেটাসের তিন দার্শনিক থ্যালেস, অ্যানাক্সিম্যান্ডার ও অ্যানাক্সিমেনেসকে বিবেচনা করা হয় 'মিলেসীয় ঘরানা'র দার্শনিক হিসেবে, তেমনি পারমেনিডেস এবং তাঁর পরবর্তী দুজন দার্শনিককে ঘিরে

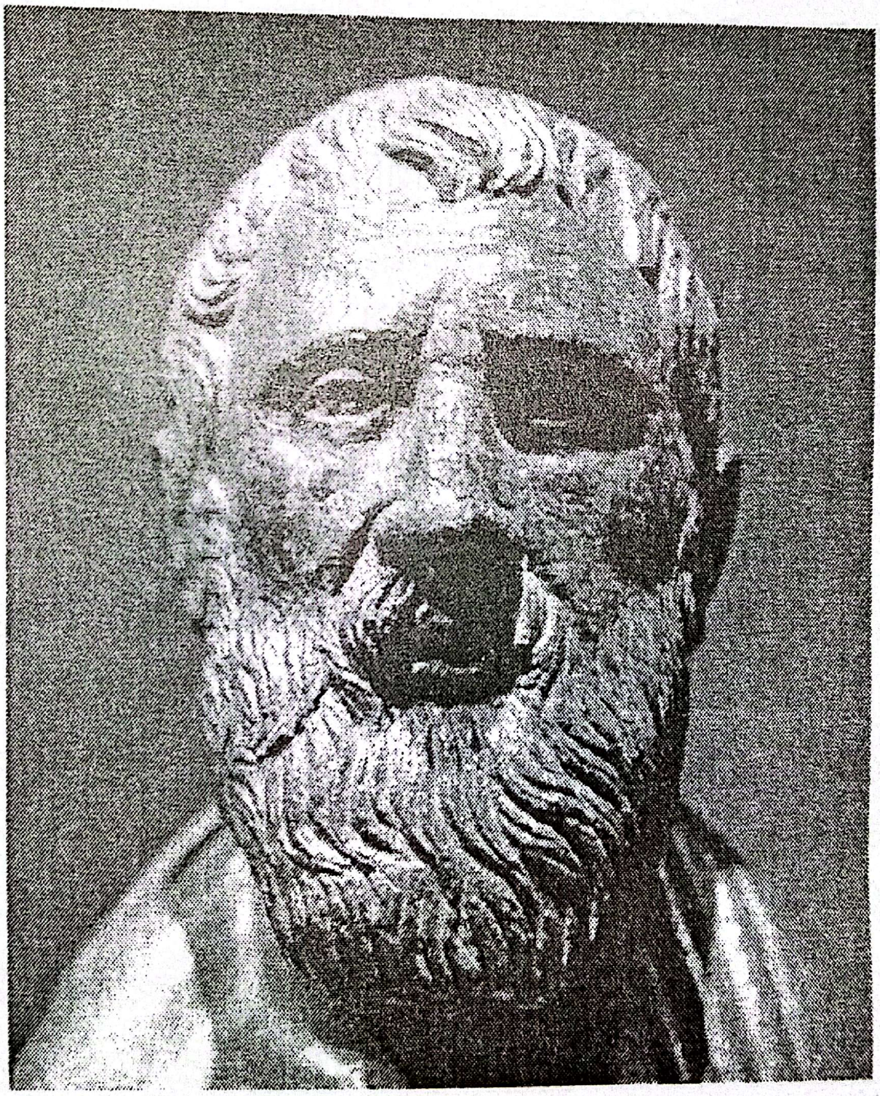

জেনো (আনু. খ্রি.পূ. ৪৯০)

গড়ে উঠেছে 'ইলিয়াটিক ঘরানা'[১১]। পারমেনিডেসের পরবর্তী প্রজন্মের এ দুই দার্শনিকের নাম যথাক্রমে, মেলিসাস[১২] ও জেনো[১৩]।

ইলিয়াটিক ঘরানার অন্তর্ভুক্ত হলেও, মেলিসাস ছিলেন স্যামোস দ্বীপের অধিবাসী। দার্শনিক পরিচয়ের পাশাপাশি, প্রাচীন গ্রিসে, নৌবাহিনীর দক্ষ একজন সেনানায়ক হিসেবে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। ৪৪১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, একবার, এথেন্সের নৌবহর স্যামোস দ্বীপ আক্রমণ করে; সে যুদ্ধে স্যামোসের নৌবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে মেলিসাস বীরত্বের পরিচয় দেন। দর্শনে তিনি পারমেনিডেসের মতের অনুসারী ছিলেন। তাঁর নিজের রচনায় তিনি মূলত পারমেনিডেসের কাব্যের 'সত্যের পথ' অংশটির সংক্ষেপিত গদ্যরূপ দিয়েছেন।

এ ঘরানার অপর দার্শনিক জেনো অবশ্য ছিলেন ইলিয়ারই অধিবাসী। তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। সম্ভবত তিনি পারমেনিডেসের সরাসরি ছাত্র ছিলেন; প্লেটোর রচনায় দেখা যায়, পারমেনিডেসের সঙ্গেই তিনি একবার এথেন্সে এসেছিলেন। বস্তুজগতের অপরিবর্তনশীলতা বিষয়ে পারমেনিডেসের মতবাদটি তাঁর হাতে আরো শক্তিশালী রূপ পায়। অ্যারিস্টটলের মতে, জেনোর দর্শনই জন্ম দিয়েছিল 'দ্বান্দ্বিকতা'[১৪]-র। ধারাবাহিক যুক্তি-প্রয়োগের মাধ্যমে জেনো দেখাতে চেয়েছেন, ইন্দ্রিয়ানুভূতির কারণে বস্তুজগতের বহুত্ব ও পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে আমাদের মনে যে অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয় তা ভ্রান্তিমূলক।

জেনোর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যগুলোর মধ্যে চারটি বিশেষভাবে বিখ্যাত। দর্শনের ইতিহাসে এদের বলা হয় 'জেনোর প্যারাডক্স'[১৫]; এগুলোতে জেনো বস্তুজগতে গতির অবাস্তবতা সম্পর্কে যুক্তি দেখিয়েছেন। এই প্যারাডক্সগুলো নিয়ে পরবর্তীকালের দার্শনিকরা মেতে উঠেছিলেন নানান তর্ক-বিতর্কে। পারমেনিডেসের দর্শনকে অবলম্বন করেই জেনো তাঁর দ্বান্দ্বিক মতবাদটি গড়ে তুলেছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

# বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ধর্মপ্রণেতা

## ধর্মপ্রণেতা আরো একজন

পারমেনিডেস এবং হেরাক্লিটাস—দুজনের দর্শনেরই প্রভাব পড়েছিল 'ম্যাগনা গ্রেসিয়া'র পরের প্রজন্মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক এম্পেডক্লেস[১]-এর ওপর। পূর্বসূরি ওই দুই দার্শনিকের মতবাদের মধ্যে যে আপাত বৈপরীত্য আছে, তার একরকম মীমাংসারও চেষ্টা আছে এম্পেডক্লেসের রচনায়। আর, তাঁর ওপর পিথাগরাসের প্রভাবও কম নয়। পিথাগরাসের মতো তিনিও ছিলেন একজন ধর্মপ্রণেতা। দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলির অনেক দার্শনিকের মতবাদের মধ্যেই দর্শন, বিজ্ঞান আর মরমী ধর্মবিশ্বাসের যে সম্মিলন দেখা যায়, বলা যায়, তার এক চরম প্রকাশ ঘটেছিল এম্পেডক্লেসের দর্শনে।

এম্পেডক্লেসের জন্ম সিসিলির আক্রাগাস[২]-এ। ধনী-সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি; তাঁর পিতামহ ৪৯৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ঘোড়দৌড়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। এম্পেডক্লেসের জীবৎকাল, আনুমানিক, ৪৯৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৪৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। সে হিসাবে, পারমেনিডেসের সমসাময়িক ছিলেন তিনি; বয়সে অবশ্য ছিলেন তরুণতর।

আক্রাগাসের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা ছিল এম্পেডক্লেসের। গণতন্ত্রপন্থী একজন নেতা ছিলেন তিনি। সে সময়ের অন্যান্য গ্রিক নগর-রাষ্ট্রের মতো আক্রাগাসেও গণতন্ত্রী এবং স্বৈরতন্ত্রীদের মাঝে ক্ষমতার

টানাপোড়েন ও হাতবদল চলছিল। একসময়, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে, আক্রাগাস ত্যাগ করতে হয় তাঁকে। তবে সে সময়ের পরাজিত অন্য নেতাদের মতো, বিরোধী রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতা পুনর্দখলের ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেননি এম্পেডক্লেস। বেছে নিয়েছিলেন একজন ধর্মপ্রবক্তার জীবন।

নানা কিংবদন্তি গড়ে উঠেছিল এম্পেডক্লেসকে ঘিরে। নানা রকম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হতো তাঁকে। আর নিজেকেও তিনি একজন দেবতা বলে মনে করতেন। তাঁর অনেক অলৌকিক ক্ষমতার উৎস, সম্ভবত, বিজ্ঞানের ওপর তাঁর অসামান্য দখল। বলা হয়, তিনি বায়ুর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। তিরিশ দিন আগে মারা গেছে এমন একজন মহিলাকে তিনি পুনর্জীবিত করেছিলেন বলেও কিংবদন্তি আছে। তাঁর জীবনের শেষ পরিণতিও চরম নাটকীয়। কথিত আছে, নিজেকে দেবতা বলে প্রমাণ করার জন্য, এটনা পর্বতের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে লাফিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

## বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক

দর্শনের ইতিহাসে, সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকদের অন্যতম একজন বলে ধরা হয় এম্পেডক্লেসকে। পাশাপাশি, তিনি ছিলেন অসাধারণ বিজ্ঞানী এবং অসামান্য একজন চিকিৎসক। অবশ্য বিজ্ঞান ও দর্শন তখন ছিল অভিন্ন। তার পরও, বিজ্ঞানী হিসেবে কী অসাধারণ মেধাবী ছিলেন তিনি, বিশেষ করে সেই খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান—বাতাসকে ভিন্ন একটি উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা। বাতাসের আলাদা অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছিলেন, কোনো বালতি বা পাত্রকে উল্টোমুখ করে জলে ডোবালে তার ভেতর জল প্রবেশ করতে পারে না; এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, ওই বালতি বা পাত্রের ভেতর বাতাস রয়েছে। জলের ভেতর বাতাসের অস্তিত্ব থেকে মানবদেহের শ্বাসপ্রশ্বাস-প্রণালিরও

এম্পেডক্লেস (খ্রি.পূ. ৪৯৫-৪৩৫)

ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন তিনি।

এ ছাড়া, অন্তত এক রকমের কেন্দ্রাতিগ[৩] বল সম্পর্কে ধারণা ছিল এম্পেডক্লেসের। একটা জলপূর্ণ পাত্রকে দড়ি বেঁধে দ্রুতবেগে ঘোরালে, সে পাত্রের জল ছিটকে পড়ে না—সে ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন।

গাছপালারও যে লিঙ্গভেদ আছে, সে সম্পর্কেও জানতেন তিনি। জীবজগতের বিবর্তন এবং 'শক্তিমত্তের টিকে থাকা'[৪] বিষয়ে তিনি অদ্ভুত এক মতবাদ খাড়া করেছিলেন। তাঁর মতে : অসংখ্য প্রজাতির আর অদ্ভুত আকৃতির সব জীবিত প্রাণী একসময় পুরো পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে ছিল। তাদের একেকটির চেহারা ছিল অন্যটির চেয়ে কিম্ভূত। তাদের কারো কারো মাথা ছিল, কিন্তু গলা ছিল না; কারো হাত ছিল, কিন্তু কাঁধ ছিল না; কারো কারো চোখ ছিল, কপাল ছিল না। এসব প্রাণীরা একটি অন্যটির সাথে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করেছিল। এইসব নতুন প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালীগুলোই কেবল টিকে থাকতে পেরেছে, আর-সব কালের গর্ভে মিলিয়ে গেছে। এমনি এক বিবর্তনতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় এম্পেডক্লেসের রচনায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়েও ভালো জ্ঞান ছিল তাঁর। তিনি জানতেন, চাঁদ নিজের আলোয় নয় বরং প্রতিফলিত আলোয় উজ্জ্বল। সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের জন্যও এ রকম আলোর প্রতিফলনকেই দায়ী করেছিলেন তিনি। আলোর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সময় লাগে, কিন্তু সে যাওয়া এত দ্রুত যে, খালি চোখে তা ধরা যায় না—বলেছিলেন এম্পেডক্লেস। সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে যে চাঁদ চলে আসে, সে ব্যাপারেও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই জ্ঞান তিনি সম্ভবত অর্জন করেছিলেন অ্যানাক্সাগরাস[৫]-এর কাছ থেকে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানেরও চর্চা করতেন এম্পেডক্লেস। নিজে ভালো চিকিৎসক ছিলেন। ওই সময়ের ইতালিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল তাঁর হাত ধরেই। তাঁর প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষায়তনটি পরবর্তীতে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলকে শরীরতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চায় উৎসাহ জুগিয়েছিল।

## চার উপাদান, দুই শক্তি

বস্তুজগতের উৎস হিসেবে থ্যালেস চিহ্নিত করেছিলেন জলকে; অ্যানাক্সিমেনেস বলেছিলেন, এর উৎস বায়ু; হেরাক্লিটাসের মতে সব কিছুর উৎস চিরন্তন অগ্নি। অবশেষে, এম্পেডক্লেসের হাতে, এই মতবাদগুলোর যেন এক মেলবন্ধন ঘটল। একক কোনো উৎসের কথা না বলে তিনি বললেন, বস্তুজগতের উৎসে আছে মূল চারটি উপাদান : জল, মাটি, হাওয়া ও আগুন।

চারটি মূল উপাদান ছাড়াও দুটি শক্তির কথা বলেছেন এম্পেডক্লেস। এরা হলো : প্রেম[৬] ও দ্বন্দ্ব[৭]। আধুনিক ধারণায় আমরা বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের কথা বলি, প্রেম ও দ্বন্দ্বকে ওই দুই বলের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তি হিসেবে দেখা যায়; অবশ্য এম্পেডক্লেস এ দুই শক্তির ওপর দেবত্ব আরোপ করেই কল্পনা করেছিলেন।

চার মূল উপাদানের সবকটিই চিরকালীন, চিরস্থায়ী। প্রেম ও দ্বন্দ্বের কারণে এদের মধ্যে বিভিন্ন অনুপাতে মিশেল ঘটে; এরই ফলশ্রুতিতে বস্তুজগতে বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি হয়। প্রেম উপাদানগুলোকে সংযুক্ত করে, আর দ্বন্দ্বের কারণে তারা বিযুক্ত হয়। সময়ের আবর্তনে প্রেম মাঝে মাঝে শক্তিশালী হয়ে ওঠে; আবার, মাঝে মাঝে দ্বন্দ্বের শক্তি যায় বেড়ে। এম্পেডক্লেস এমন একটি সময় কল্পনা করেছেন, যাকে তিনি বলেছেন 'সোনালি যুগ'[৮]; এই সোনালি যুগে প্রেমের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল।

এম্পেডক্লেসের মতে, বিশ্বজগতের পরিবর্তনের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই। এ পরিবর্তন দৈব-ঘটিত এবং তা প্রয়োজনানুসারেই ঘটে। আর, এ পরিবর্তন চক্রাকার : প্রেমের কারণে উপাদানগুলো যখন সমান হারে বিন্যস্ত হয়, দ্বন্দ্বের কারণে সে বিন্যাস পুনরায় ভাঙতে শুরু করে। দ্বন্দ্বের কারণে উপাদানগুলো বিচ্ছিন্ন হবার পরে, প্রেমের কারণে, তারা আবার মিলিত হতে শুরু করে। এই চক্রাকার পরিবর্তনের বলয়ে সব যৌগ পদার্থই অস্থায়ী—স্থায়ী কেবল মূল চারটি উপাদান এবং প্রেম ও দ্বন্দ্বের শক্তি।

বস্তুজগৎকে এম্পেডক্লেস কল্পনা করেছিলেন একটি গোলক হিসেবে। তাঁর কল্পিত সোনালি যুগে, প্রেম ছিল এ গোলকের ভেতরে আর দ্বন্দ্ব ছিল বাইরে। তারপর, ধীরে ধীরে, দ্বন্দ্ব এই গোলকে প্রবেশ করেছে এবং প্রেমের একাধিপত্যের ভিত টলিয়ে দিয়েছে। এরপর, এমন এক যুগ আসবে, যখন দ্বন্দ্বই হবে এ গোলকের সর্বাধিকারী; প্রেম তখন বাইরে ছিটকে পড়বে। তারপর—যদিও এর কোনো নির্দিষ্ট কারণ দেখাননি এম্পেডক্লেস—এর উল্টো প্রক্রিয়াটি আবার শুরু হবে এবং একসময় সোনালি যুগ আবার ফিরে আসবে। কিন্তু সোনালি যুগ কখনোই চিরস্থায়ী হবে না। পুরো চক্রটি এভাবে, বারবার, ফিরে ফিরে আসবে।

## দর্শনের পরম্পরা

সব দার্শনিকই পূর্বসূরিদের মতবাদের নানা দিক বিচার করে, তার আলোকে, নিজস্ব মতবাদ দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। এম্পেডক্লেসের ওপর ভালো রকম প্রভাব পড়েছিল পিথাগরাসের। পিথাগরাস সম্পর্কে প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর নিজের দর্শনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু দিকটি পিথাগরীয় নয়; বরং পিথাগরাসের মরমী ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল অনেক বেশি। পিথাগরাসের মতো তিনিও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতেন, বিশ্বাস করতেন আত্মার পুনর্জীবনে। এসব বিশ্বাসের সবই এসেছে লোকায়ত অরফিক ধর্মবিশ্বাস থেকে।

এ ধর্মবিশ্বাসের ছায়া পড়েছে, এমনকি প্লেটোর দর্শনেও। প্লেটো তাঁর রচনার বিখ্যাত এক অংশে, এ জগৎকে তুলনা করেছেন একটি গুহার সঙ্গে।[৯] এ গুহায় আমরা শুধু বাস্তবতার ছায়াটুকুই দেখি। সত্যিকার বাস্তব আলোকময় এক জগৎ এবং তার অবস্থান এই গুহার বাইরে। গুহার এই কল্পচিত্রের আভাস আছে এম্পেডক্লেসের রচনাতেও। আর এ দুয়েরই উৎস—লোকায়ত অরফিক ধর্ম ও বিশ্বাস।

এম্পেডক্লেসের মতবাদের সাথে হেরাক্লিটাসের মতবাদেরও মিল আছে। তবে হেরাক্লিটাস যেখানে বলেছেন শুধু দ্বন্দ্বের কথা, এম্পেডক্লেস

বলছেন প্রেম ও দ্বন্দ্ব—এ দুই শক্তির কথা। আবার, বস্তুজগতের অপরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে পারমেনিডেসের ধারণাকে আমলে এনে গতির একরকম ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন এম্পেডক্লেস। তবে তাঁর বস্তুজগৎ পারমেনিডেসের বস্তুজগতের মতো স্থির নয়। সে জগৎ গতিময়, পরিবর্তনশীল; আর সে-পরিবর্তন চক্রাকারে ফিরে ফিরে আসে।

বস্তুজগৎ সম্পর্কে এম্পেডক্লেসের ধারণার সবচেয়ে শক্তিশালী দিকটি ছিল : বস্তুজগতের মূল উপাদান হিসেবে জল, মাটি, বায়ু ও আগুন এবং দুই মৌলিক শক্তি প্রেম ও দ্বন্দ্বের কল্পনা। অ্যারিস্টটল, বস্তুজগতের গঠন ব্যাখ্যায়, এম্পেডক্লেসের এ ধারণাটি গ্রহণ করেছিলেন। আর, চার মূল উপাদান এবং দ্বান্দ্বিক শক্তির ওই ধারণা মধ্যযুগ পর্যন্ত—আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের আগ পর্যন্তই—বহাল ছিল।

নবম অধ্যায়

# এথেন্সে দর্শনচর্চা

## এথেন্সের উত্থান

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শুরুর দিকে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, পরাক্রমশালী একটি রাজ্য হিসেবে মাথা তোলে এথেন্স।

পারস্য-সম্রাট দারায়ুস ৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম গ্রিস আক্রমণ করেন। সেবার এথেন্স ও স্পার্টা সম্মিলিত প্রয়াসে সে আক্রমণ ঠেকিয়েছিল; প্রথম পারস্যযুদ্ধে গ্রিকদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন পারস্যরাজ। দারায়ুসপুত্র জেরেক্সেস এর দশ বছর পরে, ৪৮০-৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, আবার গ্রিস আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধেও গ্রিকরা বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় পারস্যযুদ্ধের সময় গ্রিক রাজ্যগুলোর মধ্যে নৌশক্তিতে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল এথেন্স। এই যুদ্ধে, জেরেক্সেসের নৌবাহিনীকে পরাজিত করে এথেন্সের অধীনে সম্মিলিত গ্রিক নৌবহর। এই বিজয়ের পর থেকে গ্রিক রাজ্যগুলোর মধ্যে এথেন্সের মর্যাদা বেড়ে যায় বহু গুণ।

পারস্যযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল এশিয়া মাইনরের আয়োনীয় রাজ্যগুলোর পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। গ্রিসের মূল ভূখণ্ড থেকে পারসিকদের বিতাড়নের পর, আয়োনীয় রাজ্যগুলোর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের কাজে লেগে যায় এথেন্স। স্পার্টানরা এথেন্সের এ প্রচেষ্টার সহযোগী হয়নি। ফলে, পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যে সম্মিলিত গ্রিক জোট গড়ে ওঠে, তার একচ্ছত্র আধিপত্য চলে আসে এথেন্সের হাতে। এই সম্মিলিত জোটের সংবিধান অনুযায়ী, জোটের অন্তর্ভুক্ত যে কোনো

রাজ্যকে সম্মিলিত নৌবহরে জাহাজ দিতে হবে, অথবা জাহাজ নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। বেশির ভাগ রাজ্য জাহাজের বদলে অর্থ জুগিয়েই এ শর্ত পূরণ করেছিল। ফলে, নৌশক্তিতে অন্য রাজ্যগুলোর চেয়ে এথেন্সের পরাক্রম আরো অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

পরবর্তীতে, শক্তিশালী এ নৌশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এথেন্স নিজস্ব এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এথেন্সের শৌর্য-বীর্যের ওই দিনগুলোয় এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন পেরিক্লিস।

## পেরিক্লিসের শাসনকাল : সংস্কৃতির উদ্ভাস

এথেন্সের ইতিহাসে সোনালি যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় পেরিক্লিসের শাসনকালকে। অত্যন্ত মেধাবী ও প্রাজ্ঞ এক রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন পেরিক্লিস; এথেন্সের নাগরিকদের দ্বারা সরাসরি নির্বাচনে নেতা হয়েছিলেন তিনি। ৪৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পেরিক্লিসের পতনের আগ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল এথেন্সের সেই 'সোনালি যুগ'। এই সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এথেন্সে অসামান্য সব কীর্তি স্থাপন। দর্শনচর্চার পীঠস্থান হিসেবে এথেন্সের পরিচিতির শুরুও এ সময় থেকেই।

স্থাপত্য, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস—একই সাথে সংস্কৃতির এই সব শাখায় যেন সৃষ্টিশীলতার বান ডেকেছিল পেরিক্লিসের শাসনকালে। ইতিহাসের পাতায় এথেন্সের এই উত্থান বিস্ময়কর এক অধ্যায়। এর আগ পর্যন্ত, বড় রকমের কোনো সাংস্কৃতিক অবদান বা ব্যক্তিত্বের দেখা মেলেনি এথেন্সে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন প্রাচীন 'সাত জ্ঞানী ব্যক্তি'র একজন বলে বিবেচিত সোলন'; কিন্তু তাঁর অবদান মূলত শাসনবিধি প্রণয়নে। ৪৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এথেন্সের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২,৩০,০০০—স্বাধীন নাগরিকদের পাশাপাশি, দাসশ্রেণীর সমস্ত জনগণও এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নগরের বাইরে, পুরো অ্যাটিকার জনসংখ্যা ছিল এর চেয়ে আরো কম। এত কম সংখ্যক মানুষের মধ্যে থেকে সাংস্কৃতিক এই অর্জন, এক কথায়, অনন্য। যুদ্ধজয়ের পরাক্রম

এবং ধনসম্পদের প্রাচুর্য দিয়ে এ অর্জনের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া মুশকিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের এথেন্সে শিল্পে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ইতিহাসে ও দর্শনে যেসব কীর্তি স্থাপিত হয়েছিল নিজস্ব সৌন্দর্য ও মেধার দীপ্তিতে সেগুলো আজও ভাস্বর।

পারস্যযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন ইসকাইলাস[২]। তাঁর হাতেই জন্ম হলো গ্রিক ট্র্যাজেডির। তাঁর আগ পর্যন্ত গ্রিক নাট্যকাররা হোমারের কাব্যের বিষয় নিয়েই নাটক রচনা করে আসছিলেন। ইসকাইলাস পারস্যযুদ্ধের সমসাময়িক বিষয়কে নাটকের বিষয়বস্তু করলেন তাঁর *পারসে*[৩] নাটকে; যুদ্ধে জেরেক্সেসের পরাজয়কে নিয়ে এলেন ট্র্যাজিক নাটকের বিষয় হিসেবে। এর পরপরই আবির্ভাব সফোক্লেস[৪]-এর; পরবর্তীতে ইউরিপিডেস[৫]-এর। ইউরিপিডেসের নাটকে ছায়া ফেলেছে গ্রিক দর্শনের সংশয়বাদ[৬]। তাঁরই সমসাময়িক অ্যারিস্টোফেনেস[৭] ছিলেন রম্যনাট্যকার। সমসাময়িক দার্শনিকদের মতবাদগুলো নিয়ে, অনেক সময়ই, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন তিনি তাঁর নাটকে। সক্রেটিসের মতো দার্শনিকও তাঁর তির্যক লেখনীর হাত থেকে রেহাই পাননি।

জেরেক্সেসের এথেন্স আক্রমণের সময় অ্যাক্রোপলিস[৮]-এর দালানগুলো সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছিল। পেরিক্লিস ক্ষমতায় এসে ওই মন্দিরগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। পারথেনন[৯] এবং এর আশপাশের গ্রিক মন্দিরগুলোর যে ভগ্নাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে আছে, তার স্থাপত্যসৌন্দর্য বিস্ময়ে এখনো আমাদের অভিভূত করে। মন্দিরের ভাস্কর্য তৈরির ভার পেরিক্লিস দিয়েছিলেন ফিডিয়াস[১০]-কে—তাঁর হাতে নির্মিত হয়েছিল বিশাল পরিসরের অনিন্দ্যসুন্দর সব দেবদেবীর মূর্তি। পেরিক্লিসের শাসনকালের শেষ পর্যায়ে এথেন্স হয়ে উঠেছিল 'হেলেনিক'[১১] গ্রিসের সবচেয়ে মনোহর নগরী।

গ্রিক ইতিহাস রচনারও শুরু পেরিক্লিসের শাসনকাল থেকে। ইতিহাসের জনক বলা হয় হেরোডটাস[১২]-কে। তিনি জন্মেছিলেন হ্যালিকারনেসাস[১৩]-এ, কিন্তু বাস করতেন এথেন্সে। পেরিক্লিস ও এথেন্সের শাসককুল হেরোডটাসকে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন ইতিহাস

রচনায়; এঁদেরই প্রণোদনায় তিনি একজন এথেন্সবাসীর দৃষ্টিতে রচনা করেন পারস্যযুদ্ধের ইতিহাস। আর, সে অনুষঙ্গে তাঁর লেখায় উঠে আসে ওই সময়ের গ্রিস ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোয় প্রচলিত নানান কিংবদন্তি ও ইতিহাস।

ওই সময়ে, এথেন্সের নাগরিকরা দর্শন বিষয়েও আগ্রহী হয়ে ওঠে। বাইরের নগরগুলো থেকে, বিভিন্ন সময়ে, দার্শনিকরা এথেন্সে আসতেন, আর তাঁদের বক্তৃতা-বিবৃতি এথেন্সবাসী সাগ্রহে শুনত। এই সময় থেকেই উত্থান সংশয়বাদী সোফিস্ট[১৪] ঘরানার দার্শনিকদের। প্লেটোর আবির্ভাব পেরিক্লিসের পরবর্তী সময়ে; কিন্তু তাঁর ডায়ালগগুলোর ঘটনাকাল হিসেবে প্লেটো বেছে নিয়েছিলেন পেরিক্লিসের সময়কালকেই। তাঁর *প্রোটাগরাস*[১৫] রচনাটিতে দেখা যায়—সোফিস্ট প্রোটাগরাস[১৬] এথেন্স ভ্রমণে এসেছেন আর এথেন্সবাসী সোৎসাহে সেই বাগ্মী দার্শনিকের বক্তব্য শুনছে।

কথিত আছে, পেরিক্লিস আমন্ত্রণ করে এথেন্সে নিয়ে এসেছিলেন অ্যানাক্সাগরাসকে। এই দার্শনিকের হাত ধরেই এথেন্সে দর্শনচর্চা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

## অ্যানাক্সাগরাস

অ্যানাক্সাগরাস ছিলেন একজন আয়োনীয়। আয়োনিয়ার, বিশেষ করে মিলেটাসের, দার্শনিকদের বস্তুবাদিতা এবং যুক্তিবাদ তাঁর দর্শনেও অটুট ছিল। তাঁর কাছ থেকেই এথেন্সের নাগরিকরা প্রথমবারের মতো সরাসরি দর্শনের পাঠ নেয়।

অ্যানাক্সাগরাসের জন্ম আয়োনিয়ার ক্ল্যাজোমিনে[১৭] শহরে, আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের দীর্ঘ তিরিশটি বছর—৪৬২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৪৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত—কাটিয়েছিলেন এথেন্সে। সম্ভবত পেরিক্লিসের আহ্বানেই তিনি এথেন্সে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। পেরিক্লিস চেয়েছিলেন, দর্শনচর্চার মধ্য দিয়ে

অ্যানাক্সাগরাস (খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৫০০–৪২৮)

এথেন্সের নাগরিকরা সুসভ্য ও পরিশীলিত মননের অধিকারী হয়ে উঠুক। নাট্যকার ইউরিপিডেসের সঙ্গেও অ্যানাক্সাগরাসের বোধ হয় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল; ইউরিপিডেসের নাটকে যে-দার্শনিক সংশয়বাদের ছোঁয়া দেখা যায়—তার উৎস সম্ভবত অ্যানাক্সাগরাসের দর্শন।

ইতিহাসের নানা দৃষ্টান্তে দেখা যায়, সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির যে কোনো শিক্ষা বা প্রচারকে সাধারণ মানুষ খুব সহজে মেনে নেয় না। এথেন্সবাসীদের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। পেরিক্লিসের জীবনের শেষের দিকে, যখন তাঁর অনেক বয়স হয়ে গেছে, তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারে নামে। প্রথম আক্রমণ আসে পেরিক্লিসের বন্ধুস্থানীয় ভাস্কর ফিডিয়াসের ওপর। অভিযোগ আনা হয়—দেব-দেবীদের মূর্তি গড়ার কাজে ফিডিয়াসকে যে পরিমাণ স্বর্ণ দেওয়া হয়েছিল, তার অনেকটাই তিনি নাকি তসরুফ করেছেন। ওই সময়ে, একই সাথে, নতুন এক আইন পাশ করা হয়, যার মাধ্যমে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে—বিশেষ করে, যাঁরা উচ্চমার্গের অবিশ্বাসী সব মতবাদ প্রচার করে বেড়ায়—এমন-সব ব্যক্তির বিচার করা যাবে। এ আইনেই অভিযোগ আনা হয় অ্যানাক্সাগরাসের বিরুদ্ধে; বলা হয়, তিনি নাকি লোককে শেখাচ্ছেন যে, সূর্য হলো জ্বলন্ত একটি পাথর, আর চাঁদ মাটি দিয়ে তৈরি। পরবর্তীকালে, সক্রেটিসকে যখন কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, তাঁর বিরুদ্ধেও একই রকম অভিযোগ আনা হয়েছিল।

অ্যানাক্সাগরাসের বিরুদ্ধে এথেন্সবাসীরা ঠিক কী ব্যবস্থা নিয়েছিল তা পরিষ্কার জানা যায় না। তবে, এর কিছুদিন পরেই তিনি এথেন্স ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সম্ভবত পেরিক্লিসই তাঁকে কয়েদখানা থেকে মুক্তি দেন এবং পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। আয়োনিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানকার ল্যাম্পসাকুস[১৮] নগরে তিনি একটি শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন। এখানেই, ৪২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, সসম্মানে মৃত্যু হয় তাঁর। ল্যাম্পসাকুসবাসী, বহু বছর পর্যন্ত, তাঁর মৃত্যুদিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে পালন করত।

## সত্তা ও বস্তুজগৎ

অ্যানাক্সাগরাস মনে করতেন, বস্তুকে অসংখ্যবার বিভাজন করা যায়, আর পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশেও বস্তুজগতের সকল উপাদান বিদ্যমান থাকে। বস্তুর মধ্যে যে উপাদানের প্রাধান্য থাকে, বস্তুটি সেই উপাদানেরই বাহ্যিক রূপ গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অ্যানাক্সাগরাসের মতে, সব বস্তুতেই আগুনের উপস্থিতি আছে; কিন্তু আমরা কোনো কিছুকে তখনই আগুন বলি, যখন তাতে আগুনের উপাদান প্রবলভাবে উপস্থিত থাকে। এম্পেডক্লেসের মতো, অ্যানাক্সাগরাসও বিশ্বজগতে শূন্যস্থানের অসম্ভবতার কথা বলেছেন; যুক্তি হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, মানুষের শরীরে যখন ফোঁড়া হয়, চামড়ার ভেতরে তখন বাতাস ঢোকে, কিন্তু বাইরে থেকে সে বাতাস দেখা যায় না।

তাঁর পূর্বসূরি দার্শনিকদের মতবাদের চেয়ে অ্যানাক্সাগরাসের মতবাদ একটি বিষয়ে স্বতন্ত্র। অ্যানাক্সাগরাস তাঁর দর্শনে মন বা সত্তাকে বস্তুজগতের একটি উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। জীবের মধ্যে প্রবেশ করে সত্তা[১৯] জড়বস্তু থেকে তাকে পৃথক অস্তিত্ব দেয়। সকল পদার্থের মধ্যে বস্তুজগতের আর-সকল উপাদানই বিদ্যমান, কেবল সত্তা ছাড়া। কেবল জীবিত প্রাণীদের মধ্যেই সত্তা আছে। এ সত্তা অসীম, স্বয়ংসিদ্ধ; কোনো কিছুর সঙ্গেই এর মিশ্রণ ঘটে না। সত্তা ছাড়া আর-সব পদার্থেই সব ধরনের বিপরীত উপাদান থাকে, যেমন গরম ও ঠাণ্ডা, সাদা ও কালো ইত্যাদি। এমনকি বরফের মধ্যেও সাদার পাশাপাশি আংশিক কালোর অস্তিত্ব থাকে বলে বিশ্বাস করতেন অ্যানাক্সাগরাস।

সত্তাই সব রকম গতির মূলে। সত্তার কারণেই বিশ্বজগৎ ঘূর্ণায়মান। এই ঘূর্ণনের ফলে, বস্তুজগতের হালকা পদার্থ জগতের প্রান্তসীমায় চলে যাচ্ছে, আর ভারি পদার্থ চলে আসছে কেন্দ্রে। সত্তার রূপ সবখানে একই; পশুপাখির মধ্যে যে সত্তা আছে তা মানুষের সত্তার চেয়ে অভিন্ন কিছু নয়। আর সকল প্রাণীর চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার শারীরিক গঠনের কারণে, মন বা সত্তার এতে কোনো ভূমিকা নেই—এমনটাই বিশ্বাস করতেন অ্যানাক্সাগরাস।

অ্যারিস্টটল ও প্লেটো দুজনেই তাঁদের রচনায় অ্যানাক্সাগরাসের সমালোচনা করে বলেছেন, অ্যানাক্সাগরাস সত্তার ধারণা উপস্থাপন করেও বস্তুজগতের ব্যাখ্যায় এর উল্লেখযোগ্য কোনো প্রয়োগ ঘটাননি। যেখানেই সম্ভব হয়েছে, তিনি বস্তুজগতের একরকম যান্ত্রিক[২০] ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। বস্তুজগৎ সৃষ্টির মূলে কোনো রকম দৈবনির্দিষ্ট ঘটনাকে স্বীকার করেননি তিনি; আবার, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের কোনো ধারণাও তাঁর দর্শনে নেই। নৈতিকতা বা ধর্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি যে খুব বেশি ভেবেছেন, তাও নয়। সম্ভবত সত্যি সত্যিই তিনি নাস্তিক ছিলেন, যেমনটা এথেন্সের আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। পিথাগরাস ছাড়া পূর্বসূরি আর-সব দার্শনিকের প্রভাব তাঁর ওপর কম-বেশি আছে। এম্পেডক্লেসের ওপর পারমেনিডেসের যে প্রভাব, অ্যানাক্সাগরাসের ওপরও সেই প্রভাব প্রায় একই রকম।

বিজ্ঞানী হিসেবেও অ্যানাক্সাগরাস ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। চাঁদের আলো যে সূর্যের আলোরই প্রতিফলন—এর প্রথম বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা তিনিই দেন। সূর্য- ও চন্দ্রগ্রহণেরও সঠিক ব্যাখ্যা দেন তিনি। এ ছাড়া, তাঁর মতে, সূর্য ও নক্ষত্রেরা সবাই জ্বলন্ত পাথর; নক্ষত্রদের তাপ আমাদের গায়ে লাগে না, কারণ এরা আমাদের চেয়ে অনেক দূরে অবস্থান করছে। অ্যানাক্সাগরাস বলতেন, সূর্য আয়তনে সমগ্র পেলোপোনেসাস[২১]-এর চেয়েও বড়, আর বিশ্বাস করতেন চাঁদেও পাহাড়-পর্বত আছে, সেইসঙ্গে আছে প্রাণের অস্তিত্বও।

মিলেসীয় ঘরানার দার্শনিকদের, বিশেষ করে অ্যানাক্সিমেনেসের, মতবাদেরই একরকম ধারাবাহিকতা দেখা যায় অ্যানাক্সাগরাসের দর্শনে। ওই পূর্বসূরিদের মতো, তাঁর দর্শনেও যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সবল প্রকাশ আছে। অন্যদিকে, পিথাগরাস থেকে সক্রেটিস, তারপর সক্রেটিস থেকে প্লেটো হয়ে গ্রিক দর্শনে ধর্মবোধ ও নৈতিকতা যেভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তার কোনো ছায়া অ্যানাক্সাগরাসের দর্শনে নেই। তবে সক্রেটিসের দর্শনের ওপর তাঁর প্রভাব আছে, নিঃসন্দেহে। আর, সে কারণেই দর্শনের ইতিহাসে তাঁর স্থান এতটা গুরুত্বপূর্ণ।

দশম অধ্যায়

# গ্রিক আণবিকবাদ

## লুসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাস

দুজন দার্শনিককে গ্রিক আণবিকবাদের জনক বলে ধরা হয়। এঁরা হলেন : লুসিপ্পাস[১] ও ডেমোক্রিটাস[২]। গ্রিক আণবিকবাদ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এ দুই দার্শনিকের নাম একসাথে উচ্চারিত হয়।

লুসিপ্পাস সম্পর্কে তেমন বেশি কিছু জানা যায় না। তাঁর জন্মস্থান সম্ভবত মিলেটাস; মিলেসীয় দার্শনিক ঘরানার বস্তুবাদ[৩] ও বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁর দর্শনেও সমান জোরালো। পারমেনিডেস ও জেনোর দর্শন দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁর সম্পর্কে প্রাচীন গ্রিকরাও এতটাই কম জানত যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে, এপিকিউরাস[৪] তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে অ্যারিস্টটলের রচনায় লুসিপ্পাসের উল্লেখ পাওয়া যায়; সেইসাথে, অ্যারিস্টটলের লেখায় লুসিপ্পাসের রচনার কিছু অংশের উদ্ধৃতিও রয়েছে। সম্ভবত, সময়ের সাথে সাথে, ডেমোক্রিটাসের মতবাদের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে লুসিপ্পাসের নিজস্ব ভাবনাগুলো মিলেমিশে গিয়েছিল।

ডেমোক্রিটাস সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে জানা যায় অনেক বেশি। তিনি উত্তর গ্রিসের অ্যাবডেরা[৫]-র অধিবাসী ছিলেন। তাঁর নিজের লেখা থেকে ধারণা করা হয়, ৪৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, অ্যানাক্সাগরাস যখন বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন তখনো ডেমোক্রিটাস বয়সে তরুণ ছিলেন। লুসিপ্পাসের ছাত্র ছিলেন তিনি। জ্ঞান আহরণের উদ্দেশে নিজের শহর ছেড়ে তিনি

দক্ষিণে ও পুবের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। সম্ভবত তিনি মিশরে গিয়েছিলেন; পারস্যে যে গিয়েছিলেন তা নিশ্চিতভাবেই জানা যায়। দেশভ্রমণ শেষে আবার নিজের শহর অ্যাবডেরায় ফিরে আসেন তিনি।

একসময় এথেন্সেও গিয়েছিলেন ডেমোক্রিটাস। অ্যানাক্সাগরাস ও সক্রেটিসকে তিনি চিনতেন; কিন্তু নিজেই জানিয়েছেন, এথেন্সবাসীরা কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি, তাঁর নামও তারা জানত না। প্লেটোর রচনায়ও ডেমোক্রিটাসের কোনো উল্লেখ নেই। সম্ভবত দার্শনিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়াতে কিছুটা সময় নেয়। অ্যারিস্টটলের রচনায় তাঁর দর্শনের আলোচনা আছে; আর, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে, দার্শনিক এপিকিউরাসের মতবাদের অনেকটাই গড়ে উঠেছিল ডেমোক্রিটাসের আণবিকবাদকে ঘিরে।

নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান ছিল তাঁর। অসংখ্য বই লিখেছিলেন তিনি। পরবর্তী গ্রিক লেখকদের রচনায় ডেমোক্রিটাস-রচিত বইয়ের যে দীর্ঘ তালিকা আমরা পাই, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের মাঝে অনন্য একটি স্থান অধিকার করে আছেন ডেমোক্রিটাস। তাঁর বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক মতবাদের বিভিন্ন দিক আমাদের সে সাক্ষ্যই দেয়।

## পদার্থের গঠন

লুসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাসের আণবিকবাদের মূল ধারণাটির জন্ম হয়েছিল লুসিপ্পাসের হাতে। তবে এ দুই দার্শনিকের ভাবনা-চিন্তাগুলো পরবর্তীকালে এতটাই মিলেমিশে গিয়েছিল যে, কোন অংশের প্রণেতা কোনজন সে-বিষয়ে আর স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। পারমেনিডেসের অদ্বৈতবাদ[৬] এবং এম্পেডক্লেসের বহুত্ববাদ[৭]-এর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার প্রচেষ্টা থেকেই তাঁদের মতবাদের জন্ম। পরবর্তী সময়ে, গুরু লুসিপ্পাসের ধারণাটির আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন ডেমোক্রিটাস, সেইসঙ্গে একে জোরালো ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। তাঁরা

দুজন, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে, পদার্থের গঠন সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে একই বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণাগুলোর আশ্চর্য মিল রয়েছে।

লুসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাসের মতে, সকল বস্তুই অণু দ্বারা গঠিত। এই অণুগুলোর বিভাজন কল্পনা করা যায়, কিন্তু বাস্তবিকভাবে তারা অবিভাজ্য। পাশাপাশি দুটি অণুর মধ্যবর্তী অংশে শূন্যস্থান আছে। অণুগুলো অবিনাশী, অজর; তারা সংখ্যায় অগণ্য। তারা সব সময় গতিশীল ছিল, আছে এবং থাকবে। বিভিন্ন প্রকার অণু আছে; এক প্রকার অণুর সাথে অন্য প্রকারের পার্থক্য নির্দিষ্ট হয় তাদের আকার ও আয়তন দ্বারা। অ্যারিস্টটল বলছেন, লুসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাসের মতে, অণুদের আকার-প্রকার নির্ধারিত হবার অন্যতম কারণ—পদার্থের উষ্ণতা। যেমন, এই দুই দার্শনিকের মতে, সবচেয়ে উষ্ণ যে আগুন, তার সকল অণু হলো গোলাকার। আর, ওজন সম্পর্কে বলতে গিয়ে অ্যারিস্টটল ডেমোক্রিটাসের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'অবিভাজ্য কণাগুলো পরিমাণে যত বেশি হবে, তাদের ওজনও তত বাড়বে।'[৮] তবে, লুসপ্পিাস ও ডেমোক্রিটাসের আণবিকবাদের ধারণায়, প্রতিটি অণুর পৃথক ভর আছে কি না, সে বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

সকল অণু সর্বদা গতিশীল। তবে, অণুর গতির উৎস সম্পর্কে খুব পরিষ্কার কোনো ব্যাখ্যা দেননি তাঁরা। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে, এপিকিউরাস যে দর্শন প্রচার করেন, তার মূলে ছিল লুসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাসের আণবিকবাদ। এপিকিউরাস তাঁর মতবাদে বলেন, সকল অণুই পতনশীল; ভারী অণুর পতনের গতি দ্রুত এবং হালকা অণুর পতনের গতি ধীর; আর, হালকা অণুগুলোর সাথে ভারী অণুর সংঘর্ষের কারণে সৃষ্টি হয় ঘূর্ণনের। ডেমোক্রিটাসের রচনার ওপর ভিত্তি করে এপিকিউরাস অণুর গতির এই ব্যাখ্যা দেন; পাশাপাশি, অ্যারিস্টটল ডেমোক্রিটাসের মতবাদের যেসব সমালোচনা করেছিলেন সেগুলোকেও এপিকিউরাস আমলে আনতে চেষ্টা করেন। তবে, লুসিপ্পাস ও

ডেমোক্রিটাসের মূল মতবাদে সম্ভবত অণুর গতির এ রকম ব্যাখ্যা ছিল না। ডেমোক্রিটাস যেমন এক জায়গায় বলেছেন, অসীম শূন্যতার মাঝে কোনো ওপর বা নিচ নেই। আবার, আত্মার অভ্যন্তরস্থ অণুগুলোকে তিনি তুলনা করেছেন সূর্যরশ্মির মাঝে ঘূর্ণায়মান ধূলিকণার সাথে।

অণুর সঙ্গে অণুর সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় ঘূর্ণনের। এই ঘূর্ণন-পরবর্তী অবস্থার যে বর্ণনা ডেমোক্রিটাস দিয়েছেন, তার সাথে অ্যানাক্সাগরাসের বর্ণনার খুব বেশি ফারাক নেই। অ্যানাক্সাগরাসের বর্ণনার সঙ্গে ডেমোক্রিটাসের ব্যাখ্যার মূল পার্থক্য হলো, অ্যানাক্সাগরাসের মতো তিনি বস্তুজগতের উৎস হিসেবে কোনো সত্তার অস্তিত্বের অবতারণা করেননি।

## বিশ্বজগতের উৎস, বিশ্বজগতের উদ্দেশ্য

প্লেটো-অ্যারিস্টটলসহ সক্রেটিস-পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে বিশ্বজগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য বা 'পরম কারণ'[৯] খোঁজার একরকম প্রয়াস দেখা যায়। গ্রিক আণবিকবাদী দার্শনিকদের মধ্যে এই প্রবণতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের উত্তরসূরি গ্রিক দার্শনিকদের চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক ছিলেন।

কোনো ঘটনার 'পরম কারণ' হলো ভবিষ্যতে ঘটবে এমন একটি ঘটনা, যাকে উদ্দেশ্য করে বর্তমান ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মানবজীবনের দৈনন্দিন যেকোনো ঘটনার ক্ষেত্রে এ রকম কারণ সব সময়ই থাকে। কেন ভাত রাঁধা হচ্ছে? কারণ আমাদের খেতে হবে। কেন রেললাইন পাতা হচ্ছে? কারণ আমাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হবে। আমরা যখন কোনো কিছু প্রসঙ্গে 'কেন' প্রশ্নটি করি, তখন আমরা মূলত দুটি জিনিস জানতে চাই। এর একটি হলো : এর দ্বারা ভবিষ্যতে কী উদ্দেশ্য সাধিত হবে? আর অন্যটি : অতীতের কোন ঘটনার কারণে এটি সংঘটিত হলো? প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তরকে আমরা 'পরমকারণবাদী'[১০] ব্যাখ্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। আর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার উত্তর আমাদের দেয় 'যান্ত্রিকবাদী'[১১] ব্যাখ্যা।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের বলে, যান্ত্রিকবাদী জিজ্ঞাসার সূত্র ধরেই জন্ম হয়েছে বিজ্ঞানের। আণবিকবাদী দার্শনিকরা বরাবর যান্ত্রিকবাদী জিজ্ঞাসারই উত্তর খুঁজেছেন। অন্যদিকে, তাঁদের উত্তরসুরি দার্শনিকদের বেশির ভাগই বিশ্বজগতের উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধানী হতে গিয়ে দ্বারস্থ হয়েছেন পরমকারণবাদের। সে জন্যই ইউরোপে, রেনেঁসার আগ পর্যন্ত দর্শনচর্চায় বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব এত বেশি। সেখানে বিজ্ঞানমনস্কতার পুনর্জন্ম হলো, যখন থেকে যান্ত্রিকবাদী জিজ্ঞাসা পরমকারণবাদকে হটিয়ে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলো। আর এ প্রচেষ্টায় পথিকৃৎ হিসেবে আজ পর্যন্ত ভাস্বর হয়ে আছেন লুসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাস এবং তাঁদের আণবিকবাদ।

## বস্তুজগৎ : শূন্যতা বনাম গতি

পারমেনিডেসের দর্শনে বস্তুজগতের অপরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, তার সাথে বাস্তবে দেখা জগৎ মেলে না। বাস্তবজগতে আমরা পরিবর্তন ও গতি দুইয়েরই অস্তিত্ব দেখি। অ্যারিস্টটল যেমন বলেছেন, 'যদিও [পারমেনিডেসের] মতামত দ্বান্দ্বিক আলোচনার যুক্তির পথ বেয়েই এসেছে, তবু বাস্তবের দিকে তাকিয়ে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অনেকটাই যেন পাগলামির শামিল।'[১২] সক্রেটিসের আগে ও পরে, অনেক দার্শনিকই বস্তুজগতের অপরিবর্তনশীলতার সাথে পরিবর্তন ও গতির ধারণাকে মেলাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। লুসিপ্পাস তাঁদেরই একজন।

পারমেনিডেসের দর্শনে বলা হয়েছে, জগৎ অপরিবর্তনশীল এবং বস্তুজগৎ এক ও অভিন্ন। অন্যদিকে, লুসিপ্পাস তাঁর মতবাদে দেখাতে চাইলেন, ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা জগতে যে 'হয়ে ওঠা'[১৩] ও 'চলে যাওয়া'[১৪] আমরা দেখি, গতির উপস্থিতি দেখি এবং বস্তুর বহুত্ব দেখি, এর সব কিছুকেই যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব। জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটিকে তিনি সত্য হিসেবে মেনে নিতে চাইলেন; একই সাথে,

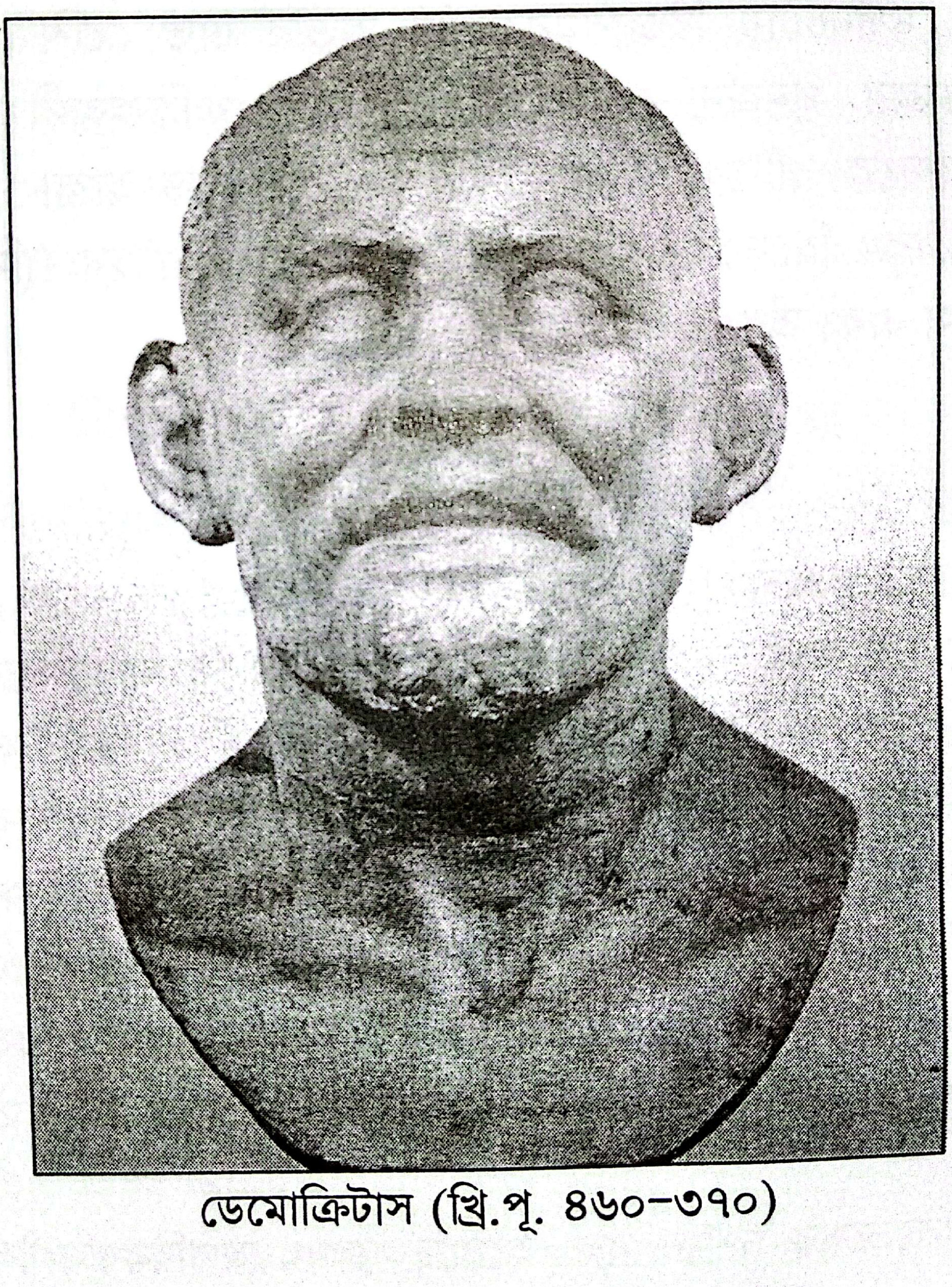

ডেমোক্রিটাস (খ্রি.পূ. ৪৬০–৩৭০)

এম্পেডক্লেসের অদ্বৈতবাদী দর্শনে যেমন বলা হয়েছে, শূন্যতা ছাড়া গতি সম্ভব নয়—সে যুক্তিকেও তিনি সমান গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করলেন। আর, এ দুইয়ের সম্মিলনেই গড়ে ওঠে তাঁর আণবিকবাদ।

লুসিপ্পাসের মতবাদের আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন ডেমোক্রিটাস। তাঁর মতে, প্রতিটি অণুই অভেদ্য, অবিভাজ্য। অণুর ভেতরে কোনো শূন্যতা নেই; শূন্যতা আছে অণুর বাইরে, এক অণু ও অন্য অণুর মধ্যবর্তী অংশে। একটি আপেলকে যখন ছুরি দিয়ে কাটা হয়, ছুরিটি আপেলের মধ্যে চলে যেতে পারে, কারণ আপেলের মধ্যে শূন্যস্থান আছে; এই শূন্যস্থান না থাকলে আপেলে ছুরিটি প্রবিষ্ট হতো না। প্রতিটি অণু অভ্যন্তরভাগে অপরিবর্তনশীল। একেকটি অণুই, সত্যিকার অর্থে, পারমেনিডেসের 'এক'। অণুগুলোর নিজস্ব গতি আছে এবং তারা একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খায়; এর ফলে, কখনো কখনো এক অণু অপর অণুর সঙ্গে মিলিত হয়। এই মিলন তখনই ঘটে যখন তারা আকারে একে অন্যের পরিপূরক হয়। নানা আকারের অণু আছে; আগুনের অণুর আকার যেমন গোলাকার। ডেমোক্রিটাসের মতে, আত্মাও অণু দিয়েই তৈরি, আর সে অণুর আকারও গোলাকার।

অণুতে অণুতে সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন হয় ঘূর্ণনের। ঘূর্ণন সৃষ্টি করে বস্তুর, সেই সাথে বস্তুজগতের। বস্তুজগৎ একটি নয়, অগণ্য। কোনো কোনো জগৎ গড়ে উঠছে, আবার কোনো কোনোটি ক্ষয় পাচ্ছে; কোনো জগতে কোনো চন্দ্র-সূর্য নেই, আবার কোনো কোনো জগতে চন্দ্র-সূর্যের সংখ্যা একাধিক। সকল জগতের শুরু ও শেষ আছে। একটি জগৎ তার চেয়ে বৃহৎ কোনো জগতের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ডেমোক্রিটাসের মতে, জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল আদিম অবস্থায়, জলকাদা থেকে। জীবিত সব প্রাণীর মধ্যে, কিছু পরিমাণে হলেও, আগুনের অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করতেন তিনি; এই আগুনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে প্রাণীর মস্তিষ্কে ও বক্ষস্থলে।

## বস্তুবাদ ও নৈতিকতা

আপাদমস্তক একজন বস্তুবাদী ছিলেন ডেমোক্রিটাস। আত্মাও অণু দিয়ে গঠিত বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। সেইসঙ্গে বিশ্বাস করতেন, চিন্তা ও দৃষ্টিশক্তির মতো যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সবটাই ভৌত[১৫] প্রক্রিয়া। চিন্তার নিজস্ব গতি আছে, ফলে চিন্তাশক্তি অন্যত্রও গতির সঞ্চার করতে পারে। আবার, তাঁর মতে, দৃষ্টিশক্তি দুই প্রকার : একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য[১৬]; অপরটি উপলব্ধিগত[১৭]। দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টিশক্তি নির্ভর করে যে বস্তুকে দেখা হচ্ছে তার ওপর, আর প্রথমটি পুরোপরি ইন্দ্রিয়ের ওপর; আর, সে কারণে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না। ডেমোক্রিটাস বিশ্বাস করতেন, বস্তুর কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন উষ্ণতা, স্বাদ ও রং, নির্ভর করে ইন্দ্রিয়ের ওপর; আর, বস্তুর অপর কিছু বৈশিষ্ট্য তার নিজস্ব, যেমন ভর, ঘনত্ব ও কঠিনতা।

বিশ্বজগতের কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে বিশ্বাস করতেন না ডেমোক্রিটাস। তাঁর মতে, জগতের সব কিছুই অণু দিয়ে গড়া, আর অণুদের সচলতার পেছনে আছে যান্ত্রিক নিয়ম। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে আস্থা ছিল না তাঁর। অ্যানাক্সাগরাসের সত্তার ধারণাটিরও বিরোধিতা করেছেন তিনি, এর বিরুদ্ধে যুক্তিও দেখিয়েছেন।

নৈতিকতা বিষয়ে তাঁর মত : জীবনের উদ্দেশ্য হলো সুখী হওয়া, আনন্দে থাকা। এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রধান উপায় হলো সংযম ও সংস্কৃতির চর্চা। সব রকমের হিংস্রতাকে ঘৃণা করতেন তিনি; আবেগের বাড়াবাড়িকেও অপছন্দ করতেন। যৌন আবেগেরও তিনি বিরোধী ছিলেন, কারণ এতে অনুভূতির উচ্ছ্বাসের আড়ালে মানুষের সচেতনতা চাপা পড়ে যায়। বন্ধুত্বকে তিনি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। সেইসাথে, তিনি বোধ হয় কিছুটা নারীবিদ্বেষীও ছিলেন। সন্তান লালন-পালনেরও বিরোধিতা করেছেন তিনি, কারণ এতে দর্শনচর্চা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বস্তুবাদসহ ডেমোক্রিটাসের দর্শনের অনেক বৈশিষ্ট্য, পরবর্তীকালে, এপিকিউরাসের হেলেনিস্টিক[১৮] দর্শনে পুনর্জীবন পায়।

একাদশ অধ্যায়

# সক্রেটিসের সময়কাল

## সক্রেটিসপূর্ব দর্শন

দর্শনের ইতিহাসে, ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত দুটি শতককে সক্রেটিসপূর্ব দর্শনের সময়কাল হিসেবে গণ্য করা হয়। সক্রেটিসের নিজের জীবৎকালও এই সময়ের অন্তর্গত। এসব দার্শনিকের কেউ কেউ সক্রেটিসের সমসাময়িক ছিলেন, যেমন অ্যানাক্সাগরাস ও ডেমোক্রিটাস; আর, পারমেনিডেস ও জেনো যখন এথেন্সে আসেন, তখন সক্রেটিস তরুণ যুবা। সক্রেটিসের নিজের দর্শনের স্বাদ অনেকটাই আমরা পাই প্লেটোর রচনা থেকে; সে দর্শনের সাথে, অনেক জায়গায়, প্লেটোর নিজের দার্শনিক ভাবনা-চিন্তা মিলেমিশে গেছে। সক্রেটিস-উত্তর দর্শনের হিসাব তাই করা হয় প্লেটোর দর্শন থেকে। আর, সক্রেটিসপূর্ব দর্শনের শেষ সীমা হিসেবে ধরা হয় সক্রেটিসের মৃত্যুসন, অর্থাৎ ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে।

তবে দর্শনচর্চায় এবং দর্শনের ইতিহাসে, সক্রেটিসপূর্ব দর্শনের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়ে গেছে; কেবল সময়ের হিসাবের মাঝে একে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। সক্রেটিসপূর্ব দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো : বস্তুজগতের সৃষ্টি বিষয়ে একরকম নিয়মতান্ত্রিক[১] ব্যাখ্যাদানের প্রচেষ্টা এবং বিশ্বজগতের ভৌত অস্তিত্ব ও গঠন বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা ও বিতর্ক। এ বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করেই অ্যারিস্টটল এই দার্শনিকদের অনেকের সম্পর্কে 'প্রাকৃতিক দার্শনিক' অভিধাটি ব্যবহার করেছিলেন। সক্রেটিসপূর্ব এই প্রাকৃতিক দার্শনিকদের দলে পড়েন : থ্যালেস ও মিলেসীয় ঘরানার অপর দুই গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক অ্যানাক্সিম্যান্ডার ও

অ্যানাক্সিমেনেস; পিথাগরাস ও তাঁর অনুসারীরা; জেনোফেনেস, হেরাক্লিটাস ও এম্পেডক্লেস; ইলিয়াটিক ঘরানার পারমেনিডেস ও জেনো; আর, ইলিয়াটিক-উত্তর আণবিকবাদীরা।

সক্রেটিসের জীবৎকালেই, এথেন্সে, আরো এক দার্শনিক ঘরানার দেখা মেলে। এই ঘরানার দার্শনিকরা ছিলেন সংশয়বাদী; এঁদের ডাকা হতো সোফিস্ট নামে। প্লেটোর রচনায় সোফিস্টদের তর্ক-বিতর্কগুলো উঠে এসেছে অনেকবার। সক্রেটিস এঁদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন; প্লেটো নিজেও এঁদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই এথেন্সে সোফিস্ট দার্শনিকদের জোরালো উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গ্রিক দর্শনের ইতিহাসে এঁদের গুরুত্ব কিছু কম নয়। তবে, সোফিস্ট দর্শনকে সক্রেটিসপূর্ব দর্শনের আওতার বাইরে রাখার অন্যতম কারণ : এই দার্শনিকদের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে ও তর্ক-বিতর্কে তথাকথিত 'প্রাকৃতিক দর্শনের' বৈশিষ্ট্যগুলোর অনুপস্থিতি।

## সোফিস্ট সংশয়বাদ

প্লেটো তাঁর লেখায় সোফিস্টদের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন; নানা রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করেছেন। অনেকটা সে কারণেই, পরবর্তী সময়ে, সোফিস্ট শব্দের অর্থের ভেতর একরকম নেতিবাচক দ্যোতনা চলে আসে। তবে, প্রাথমিকভাবে, সোফিস্ট বলতে বোঝানো হতো কোনো জ্ঞানী মানুষকে। আধুনিক যুগে, অধ্যাপক[২] বলতে আমরা যে শিক্ষকশ্রেণীকে বুঝি, প্রাচীন গ্রিসে সোফিস্ট বলতে সে রকমই এক বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষককে বোঝানো হতো। এঁরা অর্থের বিনিময়ে সাধারণ মানুষকে নানা বিষয়ে, বিশেষত তর্কশাস্ত্রে[৩], পাঠ দিতেন।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের এথেন্সে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। এক দিক থেকে, ওই শাসন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের শাসনের চেয়ে বেশি গণতান্ত্রিক ছিল। সরকারের শাসনযন্ত্রে ও বিচারব্যবস্থায় সব কর্মচারীই জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হতেন; আর, এসব পদে কিছুদিন পরপরই নতুন লোক নিয়োগ দেওয়া হতো। বিচারকাজে একাধিক বিচারপতি থাকতেন এবং এঁরাও জণগণের দ্বারা

সরাসরি নির্বাচিত হতেন। বিচারপতিসহ এসব কর্মকর্তার সবাই ছিলেন সাধারণ মানুষ—এথেন্সের মুক্ত নাগরিক; এঁদের কেউই বিশেষভাবে শিক্ষিত ছিলেন না। আবার, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে, অভিযুক্ত ও অভিযোগকারী দুজনকেই আদালতে সরাসরি কথা বলতে হতো, কোনো উকিল নিয়োগের বিধান ছিল না। মোটের ওপর, ওই সময়ের এথেন্সে, মুক্ত নাগরিকদের সকলেরই বাকচর্চা, তর্কশাস্ত্র, আইনকানুনসহ নানা বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে ওঠা জরুরি হয়ে পড়ে। আর, এ রকম শিক্ষার জন্য উপযুক্ত কোনো বিদ্যায়তন তখনো গড়ে ওঠেনি। সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার সে দায়িত্বটি, ওই সময়ে, পালন করছিলেন সোফিস্ট দার্শনিকরা।

শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হলেও, এথেন্সের পুরো অর্থনীতি দাঁড়িয়ে ছিল দাসপ্রথার ওপর। দাসদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না; সে অধিকার ছিল না নারীদেরও। তাই, জনগণের বড় একটি অংশেরই অবস্থান ছিল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বাইরে। এথেনীয় গণতন্ত্রের এটাই ছিল সবচেয়ে বড় ত্রুটি।

সোফিস্টরা মূলত শিক্ষা দিতেন তরুণ যুবকদের; সে শিক্ষাও অর্থের বিনিময়ে। শিক্ষিত এই তরুণরা সবাই ধনী বংশের, অভিজাত শ্রেণীর। দাসপ্রথার কারণে তাঁদের কোনোরকম কায়িক পরিশ্রম করতে হতো না। দেহ গঠনের জন্য ব্যায়াম ও খেলাধুলা করতেন তাঁরা; হাতে ছিল অখণ্ড অবসর। প্রাচীন গ্রিসে, তরুণ এই অভিজাত শ্রেণীর হাতেই হেলেনিক সংস্কৃতির বিকাশ। পরবর্তীকালে, এমন তরুণরাই অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন সক্রেটিসের। আর, এঁরাই মূলত ছিলেন প্লেটোর অ্যাকাডেমির ছাত্র।

ধনিক শ্রেণীর এক অংশ যেমন জ্ঞানচর্চা, সংস্কৃতিচর্চা ও দেশভ্রমণের ফলে চিন্তা-চেতনায় ক্রমশ মুক্তমনা হয়ে উঠছিল, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীটির মাঝে, এর বিপরীত স্রোতে, সনাতন মূল্যবোধ ও বিশ্বাসগুলো আরো বেশি দানা বাঁধছিল। এই দুই শ্রেণীর বিপরীতমুখী সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের সংঘর্ষও তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। এ সংঘর্ষই মূর্ত হয়ে ওঠে পেরিক্লিসের শাসনকালের শেষপাদে; এ সংঘর্ষেরই বলি হন মহামতি সক্রেটিস।

প্লেটোর রচনায় উঠে এসেছে বেশ ক'জন সোফিস্ট দার্শনিকের নাম। এঁদের মধ্যে আছেন প্রোটাগরাস[৪], হিপ্পিয়াস[৫], গর্জিয়াস[৬] এবং থ্র্যাসিমেকাস[৭]। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সোফিস্ট দার্শনিক হিসেবে বিবেচিত হন একজনই। তিনি প্রোটাগরাস।

## প্রোটাগরাস

প্রোটাগরাস জন্মেছিলেন ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, অ্যাবডেরা শহরে। উত্তর গ্রিসের ওই শহরেই জন্মেছিলেন ডেমোক্রিটাস। তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের বেশির ভাগ সময় প্রোটাগরাস গ্রিসের নানা শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন; নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সাধারণ নাগরিকদের তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পাঠ দিতেন। জানা যায়, ৪৪৪-৪৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে, থুরি[৮] নগরী এবং এর অধিবাসীদের জন্য তিনি এক গুচ্ছ আইন প্রস্তুত করে দেন। কমপক্ষে দুবার এথেন্সে গিয়েছিলেন তিনি; প্রথমবার গিয়েছিলেন ৪৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে। দ্বিতীয় যেবার গেলেন, তার বর্ণনা আছে প্লেটোর *প্রোটাগরাস* শীর্ষক ডায়ালগটিতে। আর, *থেয়াটেটাস*-এ প্লেটো আলোচনা করেছেন প্রোটাগরাসের দর্শন বিষয়ে। প্রোটাগরাসের একটি উক্তি দর্শনের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে : 'যা আছে এবং যা নেই, এ রকম সকল জিনিসের পরিমাপের একমাত্র মাপকাঠি হলো মানুষ।'[৯]

বলা হয়, অ্যানাক্সাগরাস এবং সক্রেটিসের মতো, প্রোটাগরাসের বিরুদ্ধেও এথেন্সবাসীরা অধার্মিকতার অভিযোগ এনেছিল। এর অবশ্য কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে প্রোটাগরাসের একটি রচনার শিরোনাম *দেব-দেবী সম্পর্কে*। এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন : 'দেব-দেবীদের সম্পর্কে বলতে হলে, তাঁদের অস্তিত্ব আছে কি নেই, সে সম্পর্কে আমি কিছু জানি না; দেব-দেবীরা দেখতে কেমন, সে সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা নেই। কোনো কোনো বিষয় এত অস্পষ্ট, আর মানুষের জীবনও এত সীমিত যে, সে সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা সম্ভব নয়।'[১০]

প্রোটাগরাস সম্পর্কে প্রাচীন গ্রিসে আরো একটি কাহিনী প্রচলিত

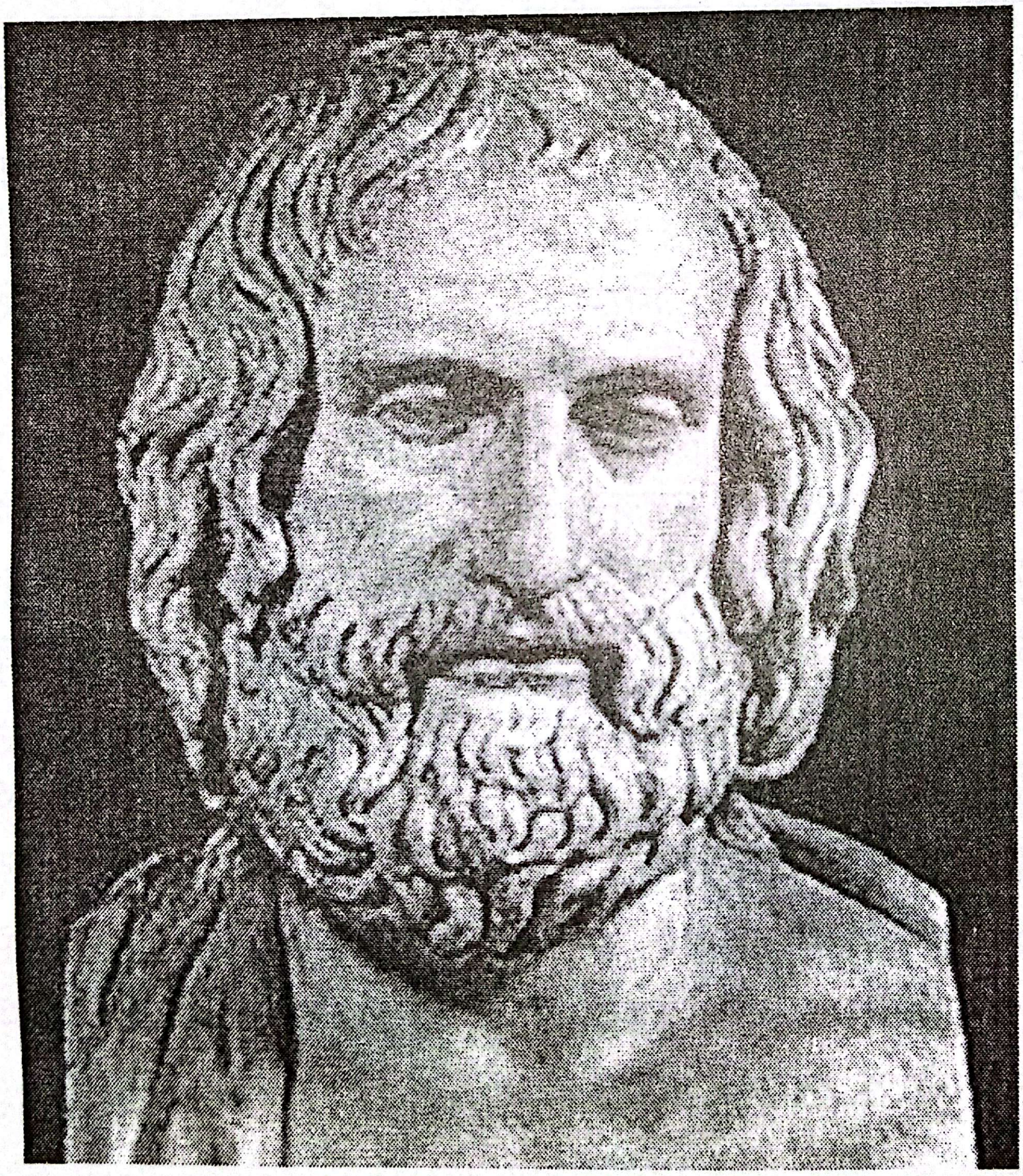

প্রোটাগরাস (খ্রি.পূ. ৫০০-৪২০)

ছিল। সাধারণ মানসে, আইন-আদালতের প্রক্রিয়াগুলোর সাথেই সোফিস্ট দার্শনিকদের মিলিয়ে দেখা হতো; সেইসঙ্গে, তাঁদের চাতুর্য ও অর্থলিপ্সারও নানা জনশ্রুতি ছিল। এ কাহিনী সেই সাক্ষ্যই দেয়। কাহিনীটি এ রকম : এক তরুণকে প্রোটাগরাস আইনশিক্ষা দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, কেবল মামলায় জিতলেই সে প্রোটাগরাসকে তাঁর সম্মানী দেবে; তারপর, শিক্ষাশেষে, প্রোটাগরাস নিজেই সেই তরুণের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেন, যাতে তিনি তাঁর প্রাপ্য অর্থ পেতে পারেন।

প্রোটাগরাসসহ আর-সকল সোফিস্ট দার্শনিকের বিরুদ্ধে প্লেটোর মূল অভিযোগ ছিল সোফিস্টরা অর্থের বিনিময়ে দর্শন শেখায়। প্লেটো নিজে অভিজাত-ধনী বংশের সন্তান ছিলেন; অর্থের প্রয়োজন তাঁর নিজের ছিল না। আর, আজকের দিনে, অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদানকে আমরা দোষের কিছু বলে মনেও করি না। প্লেটোর দ্বিতীয় অভিযোগ—সোফিস্টরা উদ্দেশ্যবিহীন তর্ক-বিতর্ক করে। প্লেটোর নিজের দর্শন উদ্দেশ্যহীন ছিল না। প্লেটোর সকল রচনার নায়ক সক্রেটিস যখন কোনো তর্কের অবতারণা করেন এবং যুক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেন, সে তর্কের আড়ালে সব সময়ই থাকে নৈতিকতার এক মানদণ্ড।

প্লেটোর দর্শন, এক অর্থে, নৈতিকতার দর্শন : ভালো ও মন্দের বিভেদ প্রতিষ্ঠা করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। প্লেটো-পরবর্তী আর কোনো দার্শনিকই নীতিশিক্ষার এই ঘেরাটোপ থেকে বের হতে পারেননি। সক্রেটিসপূর্ব দর্শন ও দার্শনিকরা, সেই অর্থে, যুক্তির নিরপেক্ষ প্রয়োগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

## সক্রেটিসের পরে

থ্যালেস থেকে শুরু করে ডেমোক্রিটাস পর্যন্ত সক্রেটিসপূর্ব সকল দার্শনিকই চেষ্টা করেছিলেন এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎকে জানতে ও বুঝতে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, রীতিমতো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন তাঁরা। মাঝে মাঝে, অবশ্যই, সনাতন বিশ্বাস, প্রচলিত ধর্মবোধ আর সে যুগের সংস্কার এসে সে দৃষ্টিকে সমাচ্ছন্ন করেছে। তারপরও, সব

বিষয়ে খুঁটিয়ে জানার আগ্রহই ছিল ওই দৃষ্টিভঙ্গির মূল বৈশিষ্ট্য।

জগতের সকল বিষয়ের প্রতিই সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকদের আগ্রহ ছিল। সে আগ্রহ একদিকে ছেলেমানুষি সরলতায় ভরা; অন্যদিকে, জানার আনন্দে টগবগে। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র-চাঁদ-সূর্য থেকে শুরু করে উল্কাপাত, ধূমকেতু, মেঘ, বৃষ্টি, রঙধনু পর্যন্ত সব কিছু নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা; গাছপালা-মাছ-প্রাণী সব কিছুকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেছিলেন; ধর্ম ও নৈতিকতাকেও প্রশ্ন করতে ছাড়েননি। ওই কৌতূহলই জন্ম দিয়েছিল বিশ্বজগতের উৎপত্তি কী করে হলো সে প্রশ্নের; সাহায্য করেছিল বস্তুর উৎপত্তি ও গঠন বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠতে। সে থেকেই জন্ম 'প্রাকৃতিক দর্শনের'; আর তার থেকে, ক্রমশ, বিজ্ঞানের।

ডেমোক্রিটাসের পর থেকেই, গ্রিক দর্শনে, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ওই দৃষ্টিভঙ্গিটি যেন হারিয়ে যেতে বসল। সক্রেটিস এবং তাঁর পরবর্তী সব দার্শনিকের মতবাদের কেন্দ্রে, বিশ্বজগতের জায়গায়, প্রতিষ্ঠা পেল—মানুষ। এর সূচনা হয়েছিল সোফিস্টদের সংশয়বাদ দিয়ে; বিশ্বজগৎ বিষয়ে জ্ঞান আহরণের চেয়ে সোফিস্টরা আগ্রহী হয়ে ওঠে 'কীভাবে আমরা কোনো কিছু জানি?' সেই প্রশ্নে। এর পর, সক্রেটিসের দর্শনে, মানুষের নৈতিকতাই মূল বিষয় হয়ে ওঠে। প্লেটো তাঁর দর্শনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের আড়ালে মননসৃষ্ট এক ভিন্ন জগৎকে প্রতিষ্ঠা দিতে সচেষ্ট হন। অ্যারিস্টটলের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পেছনেও ছিল বিশ্বজগতের উদ্দেশ্যজনিত পরমকারণবাদী বিশ্বাস।

প্লেটো ও অ্যারিস্টটল, নিঃসন্দেহে, মহান দার্শনিক ছিলেন। কিন্তু সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকদের নিরপেক্ষ জিজ্ঞাসার চারিত্র্যটি তাঁদের দর্শনে ছিল না। এই অনুপস্থিতির কারণেই পরবর্তীকালে, ধীরে ধীরে, দর্শনের সঙ্গে এসে মেশে নানা ধরনের সংস্কার ও সনাতন বিশ্বাস। মধ্যযুগে দর্শনচর্চা হয়ে ওঠে ক্যাথলিক ধর্মচর্চার নামান্তর। কেবল ইউরোপের রেনেসাঁ এবং এর পরবর্তী সময়েই, দর্শনচর্চায় ফিরে আসে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা আর সরল জিজ্ঞাসা—যা ছিল সক্রেটিসের পূর্বসূরি সকল দার্শনিক এবং তাঁদের দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য।

# তথ্যসূত্র ও টীকা

## প্রথম অধ্যায় : সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যু

১. Aegean Sea
২. Aegean Islands
৩. Ionia : এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুরস্কের) পশ্চিম প্রান্তে গ্রিক উপনিবেশ-অঞ্চলের মধ্যাংশের প্রাচীন গ্রিক নাম।
৪. Ionian Sea
৫. প্রাচীন গ্রিসের উল্লিখিত নগর-রাষ্ট্রগুলোর নাম ইংরেজিতে, যথাক্রমে : Euboea, Locris, Aetolia, Phocis ও Boetia.
৬. Laconia
৭. Attica
৮. Darius the Great (*c.* 550 – 486 BC)
৯. Xerxes I (*c.* 519 – 465 BC)
১০. Pericles (495 – 429 BC)
১১. Peloponnesian War : ৪৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এথেন্স ও তার সাম্রাজ্যের সঙ্গে স্পার্টার নেতৃত্বাধীন 'পেলোপনেসীয় লিগ'-এর মধ্যে।
১২. প্রাচীন গ্রিসের ইতিহাসে, এক বছর মেয়াদি ওই শাসনকে বলা হয় 'তিরিশ নেতার শাসন' : The Rule of the Thirty.
১৩. Plato (427 – 347 BC)
১৪. Alcibiades (450 – 404 BC)
১৫. Antisthenes (445 – 365 BC)
১৬. Aristippus of Cyrene (435 – 356 BC)
১৭. Oracle
১৮. Plato, *Apology*
১৯. "Know thyself." : Will Durant, *The Story of Philosophy*
২০. Charmides : কারমিডেস ছিলেন প্লেটোর চাচা—'তিরিশ নেতার শাসনের' এক নেতা। *কারমিডেস* শিরোনামে প্লেটোর একটি ডায়ালগ আছে; সেইসঙ্গে, *প্রোটাগরাস* ও *সিম্পোজিয়াম*-এও প্লেটো কারমিডেসের চরিত্রটির অবতারণা করেছেন।
২১. Critias (460 – 403 BC) : ক্রিটিয়াসও ছিলেন প্লেটোর আত্মীয়; 'তিরিশ নেতার শাসন'-এর অন্যতম নেতা ছিলেন তিনি। *ক্রিটিয়াস* শিরোনামেও প্লেটোর একটি ডায়ালগ আছে।
২২. Plato, *Apology*
২৩. *Phaedo*
২৪. ঐ
২৫. Will Durant, *The Story of Philosophy*

২৬. The *Academy* : প্লেটো তাঁর শিক্ষায়তনটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ৩৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই বিশ বছর (৩৬৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ–৩৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ধরে লেখাপড়া করেছিলেন অ্যারিস্টটল; প্লেটোর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর নিজের শিক্ষায়তন *লাইসিয়াম* প্রতিষ্ঠা করেন।

২৭. ৩৬৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্লেটো কিছু সময়ের জন্য সিরাকুসে গিয়েছিলেন; ৩৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি এথেন্সে ফিরে আসেন এবং তাঁর মৃত্যুর (৩৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আগ পর্যন্ত তিনি এথেন্সেই ছিলেন।

২৮. প্লেটোর *অ্যাকাডেমি* প্লেটোর মৃত্যুর পরও, হেলেনিস্টিক যুগের পুরো সময় ধরেই সংশয়বাদী দার্শনিকদের ঘাঁটি হিসেবে টিকে ছিল; ৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দার্শনিক ফিলোর মৃত্যুর পর বিদ্যায়তনটি বন্ধ হয়ে যায়। ৪১০ খ্রিস্টাব্দে নব্য-প্লেটোবাদী দার্শনিকদের হাতে বিদ্যায়তনটি পুনরায় চালু হয়। ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে, সম্রাট জাস্টিনিয়ান খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর, প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : **গ্রিক দর্শনের জনক**

১. Thales of Miletus (*fl.* 585 BC)
২. Miletus
৩. Miletians
৪. Ledia
৫. Thrace
৬. Crosus
৭. Chios
৮. Aristotle, *Politics*
৯. ‘natural science’

তৃতীয় অধ্যায় : **আরো দুই মিলেসীয়**

১. school : ইংরেজিতে school শব্দটিকে অনেক সময় বিশেষ এক অর্থে ব্যবহার করা হয়, যেমন ‘school of thought’। ‘school of philosophy’-কে এখানে বাংলায় বলা হয়েছে ‘দার্শনিক ঘরানা’।
২. Miletian School
৩. Anaximander of Miletus (*c.* 610 – *c.* 547/6 BC)
৪. Anaximenes of Miletus (*fl. c.* 546 BC)
৫. Praxiades
৬. *On Nature* : সক্রেটিসপূর্ব অনেক দার্শনিকই এই একই শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেছেন; অনেক ক্ষেত্রেই, *প্রকৃতি সম্পর্কে* শিরোনামের এ গ্রন্থগুলো রচিত হতো একেকটি দীর্ঘ কবিতার আকারে।
৭. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*
৮. Justice
৯. Aristotle, *Physics*

১০. Eurystratus
১১. Ionian Style

চতুর্থ অধ্যায় : গণিতের আরাধনা

১. Pythagoras of Samos (b. *c.* 570 BC)
২. Pythagorean
৩. prophet : নবী শব্দটিকে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মে বিশেষ এক অর্থে ব্যবহার করা হয় বলে, এখানে 'ধর্মপ্রবক্তা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
৪. mystic
৫. Samos
৬. Mnesarchus
৭. Tartessus
৮. Polycrates
৯. Amasis
১০. Cambyses
১১. Sardes
১২. Anacreon
১৩. Croton
১৪. Magna Græcia
১৫. Sybaris
১৬. Locri
১৭. Metapontion
১৮. Orphic
১৯. Orpheus
২০. Dionysus
২১. 'harmonic mean'
২২. 'harmonic progression'
২৩. atomism
২৪. geometric theorem

পঞ্চম অধ্যায় : দার্শনিক কবি

১. Homer (*fl. c.* 850 BC)
২. The *Iliad*
৩. The *Odyssey*
৪. Hesiod (*c.* 750 – 650 BC)
৫. The *Theogony*
৬. The *Metaphysics*
৭. Pherecydes of Syros (*c.* 600 BC – 550 BC)
৮. Mythologist
৯. Xenophanes of Colophon (*c.* 570 – 475 BC)
১০. Colophon
১১. Diogenes Laertius, *Lives of the Philosophers* : ডায়োজেনিস

ল্যারটিয়াস তাঁর রচিত প্রাচীন দার্শনিকদের জীবনীগ্রন্থে জেনোফেনেসের উদ্ধৃতিতে পিথাগরাস সম্পর্কিত এ গল্পটির বর্ণনা দিয়েছেন।

১২. skeptic
১৩. rationalist
১৪. divine
১৫. Heraclitus (*c.* 535 – 475 BC)

ষষ্ঠ অধ্যায় : বস্তুজগতের পরিবর্তনশীলতা

১. Ephesus
২. Hecataeus
৩. Diogenes Laertius, *Lives of Philosophers*
৪. ঐ
৫. 'the Riddler'
৬. 'the Obscure'
৭. Diogenes Laertius, *Lives of Philosophers*
৮. ঐ
৯. Clement, *Miscellanies*
১০. Plutarch, *On the E at Delphi*
১১. Clement, *Miscellanies*
১২. ঐ
১৩. ঐ
১৪. Stobaeus, *Anthology*
১৫. ঐ
১৬. ঐ
১৭. Hippolytus, *Refutation of All Heresies*
১৮. 'One'
১৯. [Aristotle], *On the World*
২০. Hippolytus, *Refutation of All Heresies*
২১. ঐ
২২. ঐ
২৩. ঐ
২৪. ঐ
২৫. 'universal justice'
২৬. Plutarch, *On Exile*
২৭. ঐ
২৮. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*
২৯. ঐ
৩০. Plato, *Cratylus*
৩১. Aristotle, *Nicomachean Ethics*
৩২. Heraclitus, *Homeric Questions*
৩৩. ঐ
৩৪. Parmenides of Elea (b. *c.* 515 BC)

সপ্তম অধ্যায় : বস্তুজগতের স্থিতি

১. Elea
২. Pyres

৩. Ameinias
৪. metaphysics
৫. logic
৬. *Way of Truth*
৭. *Way of Opinion*
৮. One
৯. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*
১০. পারমেনিডেসের অধিবিদ্যাগত যুক্তি-তর্কের সারমর্মটুকুও রাসেলের *History of Western Philosophy* থেকে নেওয়া।
১১. Eleatic School
১২. Melissus of Samos (*fl.* 441 – 440 BC)
১৩. Zeno of Elea (b. *c.* 490 BC)
১৪. dialectic
১৫. Zeno's paradoxes

অষ্টম অধ্যায় : **বৈজ্ঞানিক, ধর্মপ্রণেতা, দার্শনিক**

১. Empedocles of Acragas (*c.* 493 – *c.* 433 BC)
২. Acragas
৩. centrifugal
৪. 'survival of the fittest'
৫. Anaxagoras of Clazomenae (*c.* 500/499 – 428/427 BC)
৬. Love
৭. Strife
৮. The Golden Age
৯. Plato, *Republic*

নবম অধ্যায় : **এথেন্সে দর্শনচর্চা**

১. Solon (*c.* 638 – 558 BC) : এথেনীয় রাষ্ট্রনেতা, আইনপ্রণেতা ও কবি।
২. Aeschylus (*c.* 525/524 – 456 BC)
৩. *Persae* (The Persians)
৪. Sophocles ( *c.* 496 – 406 BC)
৫. Euripides (*c.* 480 – 406 BC)
৬. skepticism
৭. Aristophanes (*c.* 446 – 386 BC)
৮. Acropolis : এথেন্স শহরে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত নগরদুর্গ—প্রাচীন এথেন্স নগরীর প্রাণকেন্দ্র, যেখানে এ নগরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সুরম্য দালানগুলো অবস্থিত ছিল, যাদের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান।
৯. Parthenon : অ্যাক্রোপলিসের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন প্রাচীন ভবন, দেবী এথেনার মন্দির।
১০. Phidias (*c.* 490 – 430 BC)
১১. Hellenic : প্রাচীন গ্রিসের সংস্কৃতি-বিষয়ক।

১২. Herodotus ( c. 484 – 425 BC)
১৩. Halicarnassus
১৪. Sophist
১৫. Plato, *Protagoras*
১৬. Protagoras of Abdera ( *c.* 490 –*c.* 420 BC)
১৭. Clazomenae
১৮. Lampsacus
১৯. Mind
২০. mechanical
২১. Peloponnesus, Peloponnesos কিংবা Peloponnese : দক্ষিণ গ্রিসের পাহাড়ি উপদ্বীপ। এই ভূখণ্ডেই অবস্থিত ছিল প্রাচীন গ্রিসের মাইসেনি, করিন্থ, অ্যাকিয়া, আর্কেডিয়া, ল্যাকোনিয়া (স্পার্টা ছিল যার রাজধানী)—এইসব জনপদ।

দশম অধ্যায় : **গ্রিক আণবিকবাদ**

১. Leucippus of Miletus ( *fl.* 450 – 420 BC)
২. Democritus of Abdera (*c.* 460 – *c.* 370 BC)
৩. materialism
৪. Epicurus (341 – 270 BC)
৫. Abdera
৬. monism
৭. pluralism
৮. Aristotle, *Metaphysics*
৯. final cause
১০. teleological
১১. mechanistic
১২. Aristotle, *Metaphysics*
১৩. becoming
১৪. disappearing
১৫. physical
১৬. 'of the senses'
১৭. 'of understanding'
১৮. Hellenistic : ইতিহাস-বর্ণনায়, আলেক্সান্ডারের মৃত্যুর (৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পরবর্তী সময় থেকে রোমানদের উত্থানের আগ পর্যন্ত সময়কালের গ্রিক সংস্কৃতিকে 'হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি' নামে চিহ্নিত করা হয়।

একাদশ অধ্যায় : **সক্রেটিসের সময়কাল**

১. systematic
২. professor
৩. rhetoric
৪. Protagoras of Abdera (*c.* 490 – *c.* 420 BC)
৫. Hippias (*c.* 485 – 415 BC)

৬. Gorgias of Leontini (c. 483 – 376 BC)
৭. Thrasymachus (*fl.* 427 BC)
৮. Thurii : দক্ষিণ ইতালিতে অবস্থিত প্রাচীন গ্রিক উপনিবেশ-নগরী।
৯. Plato, *Theaetetus*
১০. Protagoras, *On the Gods*

## গ্রন্থপঞ্জি

Bertrand Russell রচিত *History of Western Philosophy* গ্রন্থে সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিক এবং তাঁদের দর্শন বিষয়ে মোটামুটি বিস্তৃত বর্ণনা আছে। রাসেল, তাঁর বইয়ে, সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকদের জীবন, সময় ও তাঁদের দর্শন বিষয়ে আলোচনায়, সবচেয়ে বেশি সাহায্য নিয়েছেন Burnet-এর *Early Greek Philosophy* বইটির।

রাসেলের *পশ্চিমা দর্শনের ইতিহাস* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। এর পরবর্তী পঞ্চাশ-ষাট বছরে, সক্রেটিসপূর্ব দর্শন নিয়ে আরো অনেক গবেষণা হয়েছে, রচিত হয়েছে আরো অনেক গ্রন্থ। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে সবচেয়ে সহজলভ্য হবে Penguin Classics-এর অন্তর্ভুক্ত Jonathan Barnes রচিত *Early Greek Philosophy* বইটি। ওই গ্রন্থে সক্রেটিসপূর্ব যেসব দার্শনিকের রচনা সংকলিত হয়েছে, তাঁদের প্রায় সকলের জীবন ও দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাওয়া যাবে Simon Blackburn রচিত *Oxford Dictionary of Philosophy* গ্রন্থে। এ ছাড়া, ইন্টারনেটে *উইকিপিডিয়া* এবং দর্শন বিষয়ে বেশ কয়েকটি *এনসাইক্লোপিডিয়াতেও* সক্রেটিসপূর্ব দর্শন ও দার্শনিকদের সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য আছে।

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে, সক্রেটিস ও প্লেটো এবং তাঁদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত তথ্যের অনেকটাই নেওয়া হয়েছে Will Durant রচিত *The Story of Philosophy* এবং T. Z. Lavine রচিত *From Socrates to Sartre* শীর্ষক গ্রন্থ দুটি থেকে।

নিচে, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত সক্রেটিসপূর্ব দর্শন ও দার্শনিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হলো :

M. R. Right, *The Presocratics* (Bristol, 1985)

G. S. Kirk, J. E. Raven and M. Schofield *The Presocratic Philosophers* (Cambridge, 1983 [2nd Edition])

R. Waterfield, *The First Philosophers* (Oxford, 2000)

E. Hussey, *The Presocratics* (London, 1972)

J. Barnes, *The Presocratic Philosophers* (London, 1982 [2nd edition])

A. A. Long (ed.), *The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy* (Cambridge, 1999)